Shakil Mahmud • Research Monograph

SHAKIL MAHMUD EDITORIAL & RESEARCH MONOGRAPHS

# জিনতত্ত্বের ইতিহাস

*গ্রেগর মেন্ডেলের মটরশুঁটি বাগান ও ডাবল হেলিক্স থেকে জেনেটিক কোড, স্যাঙ্গার সিকোয়েন্সিং, হিউম্যান জিনোম প্রজেক্ট, ক্রিসপার-ক্যাস৯ এবং সিন্থেটিক জীবনের ২০ খণ্ডের এক প্রামাণ্য বৈজ্ঞানিক মহাকাব্য।*

SHAKIL MAHMUD

*গবেষক ও লেখক*

SHAKIL MAHMUD EDITORIAL & RESEARCH SERIES

প্রথম সংকলিত সংস্করণ • ঢাকা ও সিঙ্গাপুর • ২০২৬

# জিনতত্ত্বের ইতিহাস

*গ্রেগর মেন্ডেলের মটরশুঁটি বাগান ও ডাবল হেলিক্স থেকে জেনেটিক কোড, স্যাঙ্গার সিকোয়েন্সিং, হিউম্যান জিনোম প্রজেক্ট, ক্রিসপার-ক্যাস৯ এবং সিন্থেটিক জীবনের ২০ খণ্ডের এক প্রামাণ্য বৈজ্ঞানিক মহাকাব্য।*

**LIBRARY & CATALOGING-IN-PUBLICATION DATA**

**Title:** জিনতত্ত্বের ইতিহাস
**Author:** Shakil Mahmud
**Series:** Shakil Mahmud Editorial & Research Series (Monograph Collection)
**Subjects:** Science -- History -- Philosophy -- Mathematics -- Civilization
**Published:** Dhaka & Singapore, 2026
**Format:** Digital Monograph Offprint (PDF) • Complete 20-Part Collected Edition
**Permanent URI:** https://shakilmahmud.com/series/genetics/

**প্রস্তাবিত সাইটেশন:**
Mahmud, Shakil. (2026). *জিনতত্ত্বের ইতিহাস: The Complete 20-Part Collected Monograph*. Shakil Mahmud Research Series. https://shakilmahmud.com/series/genetics/

**Open Scholarly Access:** This collected monograph is published under Open Scholarly Access for personal study, academic citation, university pedagogy, and non-commercial research.

© 2026 Shakil Mahmud. All rights reserved. Typeset and published at Dhaka and Singapore.

Shakil Mahmud • Research Monograph

তাত্ত্বিক ভূমিকা

# ভূমিকা: জ্ঞানের একীভূত রূপরেখা

ব্নোর সেন্ট থমাস মঠের মটরশুঁটি বাগান ও টমাস হান্ট মরগানের ফ্লাই রুম থেকে শুরু করে ডাবল হেলিক্স, সেন্ট্রাল ডগমা, হিউম্যান জিনোম প্রজেক্ট, ক্রিসপার-ক্যাস৯ এবং সিন্থেটিক জীবনের সূচনা—জিনতত্ত্বের ইতিহাস হলো জীবনের আণবিক সংবিধান পাঠ ও পুনর্লিখনের এক প্রামাণ্য মহাকাব্য। বিশ খণ্ডে সংকলিত এই গবেষণা মনোগ্রাফ বংশগতির কণিকাগত উপাদান থেকে প্রোগ্রামযোগ্য জীবজগতের বিবর্তনের সামগ্রিক রূপরেখা উপস্থাপন করে।

এই গবেষণামূলক কাজের উদ্দেশ্য কেবল তথ্য উপস্থাপন নয়, বরং চিন্তার গভীর বিকাশকে পাঠকের সামনে উন্মোচন করা। প্রতিটি পরিচ্ছদ এক একটি যুগান্তকারী বৌদ্ধিক সংকটের সমাধান হিসেবে কীভাবে আবির্ভূত হয়েছে, তা এখানে পদ্ধতিগতভাবে লিপিবদ্ধ করা হলো।

*— Shakil Mahmud*
*Dhaka & Singapore, 2026*

অধ্যায় সূচি

# সূচিপত্র

## প্রথম পর্যায়: প্রাচীন ও শাস্ত্রীয় যুগ

খণ্ড ১ — মঠের বাগানের সন্ন্যাসী — গ্রেগর মেন্ডেল, কণিকাগত বংশগতি ও পৃথকীকরণ সূত্র — 790 শব্দ
*মঠের বাগানের সন্ন্যাসী — গ্রেগর মেন্ডেল, কণিকাগত বংশগতি ও পৃথকীকরণ সূত্র*

খণ্ড ২ — মাছি শিকারীদের গবেষণাগার — টমাস হান্ট মরগান, ড্রোসোফিলা ও ক্রোমোজোমীয় লিংকেজ — 756 শব্দ
*মাছি শিকারীদের গবেষণাগার — টমাস হান্ট মরগান, ড্রোসোফিলা ও ক্রোমোজোমীয় লিংকেজ*

খণ্ড ৩ — রূপান্তরক উপাদান — ফ্রেডেরিক গ্রিফিথ, অসওয়াল্ড অ্যাভেরি ও নিউমোকক্কাসের রহস্য — 680 শব্দ
*রূপান্তরক উপাদান — ফ্রেডেরিক গ্রিফিথ, অসওয়াল্ড অ্যাভেরি ও নিউমোকক্কাসের রহস্য*

খণ্ড ৪ — ব্লেন্ডার পরীক্ষা — অ্যালফ্রেড হার্শি, মার্থা চেজ ও ব্যাকটেরিওফাযের ফসফরাস নিউক্লিয়াস — 650 শব্দ
*ব্লেন্ডার পরীক্ষা — অ্যালফ্রেড হার্শি, মার্থা চেজ ও ব্যাকটেরিওফাযের ফসফরাস নিউক্লিয়াস*

খণ্ড ৫ — বংশগতির জ্যামিতি — রোজালিন্ড ফ্র্যাঙ্কলিন, মরিস উইলকিন্স, ওয়াটসন, ক্রিক ও ডাবল হেলিক্স — 585 শব্দ
*বংশগতির জ্যামিতি — রোজালিন্ড ফ্র্যাঙ্কলিন, মরিস উইলকিন্স, ওয়াটসন, ক্রিক ও ডাবল হেলিক্স*

## দ্বিতীয় পর্যায়: মধ্যযুগীয় রূপান্তর

খণ্ড ৬ — সেন্ট্রাল ডগমা — ফ্রান্সিস ক্রিক, অ্যাডাপ্টার অণু ও তথ্যের একমুখী প্রবাহ — 568 শব্দ
*সেন্ট্রাল ডগমা — ফ্রান্সিস ক্রিক, অ্যাডাপ্টার অণু ও তথ্যের একমুখী প্রবাহ*

খণ্ড ৭ — ত্রয়ী সংকেতের পাঠোদ্ধার — মার্শাল নিরেনবার্গ, হর গোবিন্দ খোরানা ও পলি-ইউ পরীক্ষা — 623 শব্দ
*ত্রয়ী সংকেতের পাঠোদ্ধার — মার্শাল নিরেনবার্গ, হর গোবিন্দ খোরানা ও পলি-ইউ পরীক্ষা*

খণ্ড ৮ — অপারনের যুক্তি — ফ্রাঁসোয়া জ্যাকব, জ্যাক মনোদ ও অ্যালস্টেরিক জিন নিয়ন্ত্রণ — 650 শব্দ
*অপারনের যুক্তি — ফ্রাঁসোয়া জ্যাকব, জ্যাক মনোদ ও অ্যালস্টেরিক জিন নিয়ন্ত্রণ*

খণ্ড ৯ — গতিশীল জিন — বারবারা ম্যাকক্লিন্টক, ট্রান্সপোজন ও ভুট্টার রঙিন মোজাইক — 729 শব্দ
*গতিশীল জিন — বারবারা ম্যাকক্লিন্টক, ট্রান্সপোজন ও ভুট্টার রঙিন মোজাইক*

খণ্ড ১০ — রাসায়নিক লিপির পাঠোদ্ধার — ফ্রেডেরিক স্যাঙ্গার, ডাইডেক্সিনিউক্লিওটাইড ও প্রথম জীবন্ত জিনোম — 674 শব্দ
*রাসায়নিক লিপির পাঠোদ্ধার — ফ্রেডেরিক স্যাঙ্গার, ডাইডেক্সিনিউক্লিওটাইড ও প্রথম জীবন্ত জিনোম*

## তৃতীয় পর্যায়: আধুনিক বিপ্লব ও বিজ্ঞান

খণ্ড ১১ — শূন্য থেকে বিস্তার — কেরি মুলিস, তাপীয় চক্র ও পিসিআর বিপ্লব — 728 শব্দ
*শূন্য থেকে বিস্তার — কেরি মুলিস, তাপীয় চক্র ও পিসিআর বিপ্লব*

খণ্ড ১২ — রিকম্বিন্যান্ট প্রকৌশলী — পল বার্গ, হার্বার্ট বয়ার, স্ট্যানলি কোহেন ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সূচনা — 699 শব্দ
*রিকম্বিন্যান্ট প্রকৌশলী — পল বার্গ, হার্বার্ট বয়ার, স্ট্যানলি কোহেন ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সূচনা*

Shakil Mahmud • Research Monograph

| | | |
|---|---|---|
| খণ্ড ১৩ | মানবজাতির মহাকাব্য — হিউম্যান জিনোম প্রজেক্ট, ক্রেইগ ভেন্টর, ফ্রান্সিস কলিন্স ও শটগান সিকোয়েন্সিং<br>*মানবজাতির মহাকাব্য — হিউম্যান জিনোম প্রজেক্ট, ক্রেইগ ভেন্টর, ফ্রান্সিস কলিন্স ও শটগান সিকোয়েন্সিং* | 657 শব্দ |
| খণ্ড ১৪ | ক্ষারজোড়ের বাইরে — কনরাড ওয়াডিংটন, হিস্টোন অ্যাসিটাইলেশন ও এপিজেনেটিক্স<br>*ক্ষারজোড়ের বাইরে — কনরাড ওয়াডিংটন, হিস্টোন অ্যাসিটাইলেশন ও এপিজেনেটিক্স* | 735 শব্দ |
| খণ্ড ১৫ | অচেনা ট্রান্সক্রিপ্টোম — নন-কোডিং আরএনএ, মাইক্রো-আরএনএ, স্প্লাইসিং ও এনকোড স্থাপত্য<br>*অচেনা ট্রান্সক্রিপ্টোম — নন-কোডিং আরএনএ, মাইক্রো-আরএনএ, স্প্লাইসিং ও এনকোড স্থাপত্য* | 634 শব্দ |

## চতুর্থ পর্যায়: সমকালীন যুগ ও ভবিষ্যতের দিগন্ত

| | | |
|---|---|---|
| খণ্ড ১৬ | জনসংখ্যার গণিত — হার্ডি-ওয়েনবার্গ, সিওয়াল রাইট, মটো কিমুরা ও নিউট্রাল থিওরি<br>*জনসংখ্যার গণিত — হার্ডি-ওয়েনবার্গ, সিওয়াল রাইট, মটো কিমুরা ও নিউট্রাল থিওরি* | 611 শব্দ |
| খণ্ড ১৭ | প্রাচীন ডিএনএ-র পুনরুত্থান — সভান্তে প্যাবো, প্যালিয়োজেনোমিক্স ও ডেনিসোভান রহস্য<br>*প্রাচীন ডিএনএ-র পুনরুত্থান — সভান্তে প্যাবো, প্যালিয়োজেনোমিক্স ও ডেনিসোভান রহস্য* | 642 শব্দ |
| খণ্ড ১৮ | প্রোগ্রামযোগ্য আণবিক স্ক্যালপেল — জেনিফার ডাউডনা, ইমানুয়েল চার্পেনশিয়ে ও ক্রিসপার-ক্যাস৯<br>*প্রোগ্রামযোগ্য আণবিক স্ক্যালপেল — জেনিফার ডাউডনা, ইমানুয়েল চার্পেনশিয়ে ও ক্রিসপার-ক্যাস৯* | 678 শব্দ |
| খণ্ড ১৯ | কৃত্রিম ক্রোমোজোম — ক্রেইগ ভেন্টর, JCVI-syn3.0 ও সিন্থেটিক জীবনের সূচনা<br>*কৃত্রিম ক্রোমোজোম — ক্রেইগ ভেন্টর, JCVI-syn3.0 ও সিন্থেটিক জীবনের সূচনা* | 637 শব্দ |
| খণ্ড ২০ | মহাবিশ্বের পরবর্তী অধ্যায় — প্রাইম এডিটিং, জিন ড্রাইভ ও জীবনের স্বাধীন স্থাপত্য<br>*মহাবিশ্বের পরবর্তী অধ্যায় — প্রাইম এডিটিং, জিন ড্রাইভ ও জীবনের স্বাধীন স্থাপত্য* | 783 শব্দ |

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • প্রথম খণ্ড

# মঠের বাগানের সন্ন্যাসী — গ্রেগর মেন্ডেল, কণিকাগত বংশগতি ও পৃথকীকরণ সূত্র

*মঠের বাগানের সন্ন্যাসী — গ্রেগর মেন্ডেল, কণিকাগত বংশগতি ও পৃথকীকরণ সূত্র*

790 শব্দ • November 2, 2026 • ওয়েব সংস্করণ



**চিত্র ১:** *গ্রেগর ইয়োহান মেন্ডেল: আধুনিক জিনতত্ত্বের জনক এবং পৃথকীকরণ ও স্বাধীন সঞ্চারণ সূত্রের আবিষ্কারক।*

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে জীববিজ্ঞানের কাছে প্রজাতির বিবর্তনের এক অপূর্ব তত্ত্ব উপস্থিত ছিল, কিন্তু সেই বিবর্তনকে চালনা করার আণবিক ইঞ্জিন সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের কোনো ধারণাই ছিল না। ১৮৫৯ সালে চার্লস ডারউইন তাঁর অমর গ্রন্থ *অন দ্য অরিজিন অব স্পিসিস* প্রকাশ করেন, যেখানে তিনি দেখান যে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে জীবের ধারাবাহিক বাহ্যিক বৈচিত্র্য থেকে নতুন প্রজাতির জন্ম হয়। কিন্তু ডারউইনের এই মহান তত্ত্বের পেছনে লুকিয়ে ছিল এক মারাত্মক তাত্ত্বিক দুর্বলতা: তৎকালীন সমাজে বিশ্বাস করা হতো **মিশ্রিত বংশগতি** (Blending Inheritance)। এই মতবাদ অনুযায়ী পিতা-মাতার বংশগত উপাদান তরল রঙের মতো মিশে যায়—কালো ও সাদা রঙের তরল মেশালে যেমন ধূসর রঙ তৈরি হয়। যদি কোনো জীবের মাঝে আকস্মিকভাবে কোনো উপকারী নতুন বৈশিষ্ট্য দেখা দেয়, তবে স্বাভাবিক সঙ্গীর সাথে প্রজননের ফলে পরবর্তী প্রতি প্রজন্মে সেই বৈশিষ্ট্য অর্ধেক পরিমাণে ক্ষয়প্রাপ্ত হবে এবং কয়েক প্রজন্মের মধ্যে চিরতরে হারিয়ে যাবে। ফলে প্রাকৃতিক নির্বাচন তাকে টিকিয়ে রাখার সুযোগই পাবে না।

এই ঐতিহাসিক আপাতবিরোধের গাণিতিক সমাধান কোনো অক্সফোর্ড, প্যারিস কিংবা বার্লিনের খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্জিত হয়নি; বরং তা ঘটেছিল বর্তমান চেক প্রজাতন্ত্রের ব্রনো শহরের সেন্ট থমাস মঠের মাত্র ৩৫ মিটার দৈর্ঘ্যের এক শান্ত চারকোনা বাগানে। সেখানে ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞান ও সম্ভাব্যতা তত্ত্বে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অগাস্টিনিয়ান সন্ন্যাসী **গ্রেগর ইয়োহান মেন্ডেল** (১৮২২–

Shakil Mahmud • Research Monograph

১৮৮৪) শুরু করেছিলেন আট বছরব্যাপী এক ঐতিহাসিক গবেষণা, যা জীবদেহের অবিচ্ছিন্ন তরল বংশগতির ধারণাকে চিরতরে ধূলিসাৎ করে দিয়েছিল।

## মটরশুঁটি গাছের পরীক্ষামূলক যুক্তি

১৮৫৬ থেকে ১৮৬৩ সালের মধ্যে মেন্ডেল ২৮,০০০ এরও বেশি মটরশুঁটি গাছের (*Pisum sativum*) কৃত্রিম পরাগায়ন ঘটিয়েছিলেন এবং প্রতিটি গাছের বংশগত পরিবর্তন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে গণনা করেছিলেন। তাঁর এই সাফল্যের মূল রহস্য ছিল কিছু অভূতপূর্ব বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত:

- **সুনির্দিষ্ট ও স্পষ্ট বৈসাদৃশ্যমূলক বৈশিষ্ট্য:** উদ্ভিদের উচ্চতা বা পাতার আয়তনের মতো অস্পষ্ট ও অবিচ্ছিন্ন বৈশিষ্ট্যের পেছনে না ছুটে মেন্ডেল মটরশুঁটির সাতটি সুনির্দিষ্ট বিপরীতমুখী জোড়া নির্বাচন করেন: গোল বনাম কুঁচকানো বীজ, হলুদ বনাম সবুজ বীজপত্র, বেগুনি বনাম সাদা ফুল, স্ফীত বনাম খাঁজকাটা ফল, কাঁচা ফলের সবুজ বনাম হলুদ রঙ, অক্ষীয় বনাম প্রান্তিক ফুল এবং দীর্ঘ বনাম খর্বাকৃতি কাণ্ড।
- **বিশুদ্ধ বংশধারার অভিভাবক নির্বাচন:** মূল সংকরায়ণ শুরুর পূর্বে মেন্ডেল দুই বছর ধরে নিশ্চিত হয়েছিলেন যে তাঁর পরীক্ষাধীন উদ্ভিদগুলো বহু প্রজন্ম ধরে বিশুদ্ধ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে আসছে।
- **পরিমাণগত পরিসংখ্যান ও সম্ভাবনা তত্ত্ব:** কেবল চোখ দিয়ে পর্যবেক্ষণ না করে মেন্ডেল পরবর্তী প্রজন্মগুলোর ($F_1$, $F_2$, $F_3$) হাজার হাজার বংশধরের প্রতিটি বীজ আলাদাভাবে গণনা করেন এবং সেগুলোকে সম্ভাবনা তত্ত্বের নিয়মে বিশ্লেষণ করেন।

বিশুদ্ধ গোল বীজযুক্ত গাছের সাথে খাঁটি কুঁচকানো বীজযুক্ত গাছের পরাগায়ন ঘটালে প্রথম অপত্য প্রজন্মে ($F_1$) কোনো আধা-কুঁচকানো মধ্যবর্তী বীজ পাওয়া গেল না। আশ্চর্যজনকভাবে প্রতিটি গাছে কেবল নিখুঁত গোল বীজ উৎপন্ন হলো; কুঁচকানো বৈশিষ্ট্যটি যেন সম্পূর্ণ উবে গেল। মেন্ডেল এই প্রকাশিত গোল বৈশিষ্ট্যকে বললেন **প্রকট** (Dominant) এবং সুপ্ত থাকা কুঁচকানো বৈশিষ্ট্যকে বললেন **প্রচ্ছন্ন** (Recessive)।

## পৃথকীকরণ সূত্র (The Law of Segregation)

আসল বৈজ্ঞানিক চমক দেখা গেল যখন মেন্ডেল প্রথম প্রজন্মের ($F_1$) গাছগুলোকে নিজেদের মধ্যে স্ব-পরাগায়ন ঘটিয়ে দ্বিতীয় অপত্য প্রজন্ম ($F_2$) তৈরি করলেন। প্রচলিত তরল সংমিশ্রণ মতবাদ সত্যি হলে কুঁচকানো রূপটি চিরতরে নষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় প্রজন্মে কুঁচকানো বীজ আবার সম্পূর্ণ অক্ষত ও অবিকৃত অবস্থায় ফিরে এলো। মেন্ডেলের সংগৃহীত ৭,৩২৪টি বীজের মধ্যে ৫,৪৭৪টি ছিল গোল এবং ১,৮৫০টি ছিল কুঁচকানো—যার গাণিতিক অনুপাত ছিল নিখুঁত **২.৯৬ : ১**, অর্থাৎ কার্যকরভাবে ৩ : ১।

> *“সংকর জীবের মধ্যে প্রতিটি বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যের আচরণ অন্য বৈশিষ্ট্যের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকে। একটি জোড়া বৈশিষ্ট্যের জন্য যে নিয়মের প্রকাশ ঘটে, তা অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য।”*
> *— গ্রেগর মেন্ডেল, উদ্ভিদ সংকরায়ণ পরীক্ষা (১৮৬৬)*

এই নির্দিষ্ট অনুপাত ব্যাখ্যার জন্য মেন্ডেল জিনতত্ত্বের **প্রথম সূত্র বা পৃথকীকরণ সূত্র** প্রদান করেন। জীবের প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের জন্য একজোড়া অবিভাজ্য ও কণিকাগত উপাদান (মেন্ডেলের ভাষায় *এলিমেন্টে*, যা আজকের অ্যালিল) দায়ী। জননকোষ (পরাগ ও ডিম্বক) সৃষ্টির সময় এই জোড়া উপাদানগুলো পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং প্রতিটি জননকোষে কেবল একটি উপাদান প্রবেশ করে। প্রকট উপাদানকে $R$ এবং প্রচ্ছন্ন উপাদানকে $r$ ধরলে:

- অভিভাবক প্রজন্ম: $RRtimesrrrightarrow$ প্রথম প্রজন্মের সকল উদ্ভিদ হেটেরোজাইগাস $Rr$ (ফলাফল: গোল বীজ)।
- প্রথম প্রজন্মের স্ব-পরাগায়ন: $RrtimesRrrightarrow$ জননকোষের মিলনে উৎপন্ন হয় $RR + 2Rr + rr$।

- জিনোটাইপ অনুপাত: ১, $RR$ : ২, $Rr$ : ১, $rr$ (যা ফিনোটাইপে প্রকাশ করে ৩ : ১ প্রকট বনাম প্রচ্ছন্ন রূপ)।

## স্বাধীন সঞ্চারণ সূত্র ও নীরব মহাকাব্য

একই সাথে দুটি ভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে কাজ করে (যেমন হলুদ-গোল বীজের সাথে সবুজ-কুঁচকানো বীজের সংকরায়ণ) মেন্ডেল আবিষ্কার করেন তাঁর **দ্বিতীয় সূত্র: স্বাধীন সঞ্চারণ সূত্র** (Law of Independent Assortment)। দ্বিতীয় প্রজন্মে বৈশিষ্ট্যগুলো (৩ : ১)$times$(৩ : ১) = ৯ : ৩ : ৩ : ১ অনুপাতে স্বাধীনভাবে বিন্যস্ত হলো। বীজের রঙ নির্ধারণকারী উপাদানটি বীজের আকৃতি নির্ধারণকারী উপাদানের ওপর কোনোভাবেই নির্ভরশীল ছিল না।

১৮৬৫ সালের বসন্তে মেন্ডেল যখন ব্রনো ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটিতে তাঁর প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, তখন উপস্থিত উদ্ভিদবিজ্ঞানীরা ভদ্রভাবে করতালি দিলেও এর অন্তর্নিহিত বৈপ্লবিক অর্থ উপলব্ধি করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হন। তাঁরা বর্ণনামূলক উদ্ভিদবিদ্যায় অভ্যস্ত ছিলেন; ফলে মেন্ডেলের এই গাণিতিক ও পরিসংখ্যানিক সমীকরণ তাঁদের কাছে দুর্বোধ্য মনে হয়েছিল। ১৮৬৬ সালে প্রকাশিত হয়ে ইউরোপের প্রধান প্রধান লাইব্রেরিতে চলে গেলেও মেন্ডেলের কাজ টানা ৩৪ বছর লোকচক্ষুর অন্তরালে বিস্মৃত হয়ে রইল। ১৮৮৪ সালে ব্রাইট রোগে আক্রান্ত হয়ে মেন্ডেল যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন মঠের পরবর্তী প্রধান তাঁর গবেষণাপত্রগুলো পুড়িয়ে ফেলেন। কিন্তু মেন্ডেল তাঁর আবিষ্কারের সত্যতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিলেন; সহকর্মী সন্ন্যাসীদের তিনি প্রায়ই বলতেন: *“একদিন আমার সময় অবশ্যই আসবে।”*

❦

*সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "মঠের বাগানের সন্ন্যাসী — গ্রেগর মেন্ডেল, কণিকাগত বংশগতি ও পৃথকীকরণ সূত্র"। জিনতত্ত্বের ইতিহাস, খণ্ড ১।*
*https://shakilmahmud.com/bn/story-of-genetics-part-01-monk-garden-mendel-particulate-inheritance-segregation-bn/*

Shakil Mahmud • Research Monograph

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • দ্বিতীয় খণ্ড

# মাছি শিকারীদের গবেষণাগার — টমাস হান্ট মরগান, ড্রোসোফিলা ও ক্রোমোজোমীয় লিংকেজ

*মাছি শিকারীদের গবেষণাগার — টমাস হান্ট মরগান, ড্রোসোফিলা ও ক্রোমোজোমীয় লিংকেজ*

756 শব্দ • November 2, 2026 • ওয়েব সংস্করণ

❖



**চিত্র ২:** *টমাস হান্ট মরগান: ড্রোসোফিলা মাছির মাধ্যমে বংশগতির ক্রোমোজোম তত্ত্ব ও জেনেটিক লিংকেজ প্রমাণকারী নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী।*

মেন্ডেলের গবেষণাপত্র প্রকাশের দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর পর, ১৯০০ সালের বসন্তে ইউরোপের তিনজন উদ্ভিদবিজ্ঞানী—নেদারল্যান্ডসের হুগো দ্য ভ্রিস, জার্মানির কার্ল কোরেন্স এবং অস্ট্রিয়ার এরিখ ফন শেরমাক—স্বতন্ত্রভাবে মেন্ডেলের সূত্রগুলো পুনর্নিশ্চিত করেন। একই সাথে কোষতত্ত্ববিদরা উন্নত অয়েল-ইমার্শন মাইক্রোস্কোপ ও অ্যানিলিন রঞ্জকের সাহায্যে কোষের নিউক্লিয়াসের ভেতরে এক বিস্ময়কর দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছিলেন: কোষ বিভাজনের সময় গাঢ় সুতার মতো কিছু কাঠামো ঘনীভূত হয়, দ্বিগুণ হয় এবং অপত্য কোষগুলোতে সুষমভাবে পৃথক হয়ে যায়। ১৯০২ সালে ওয়াল্টার সাটন ও থিওডোর বোভেরি প্রস্তাব করেন **সাটন-বোভেরি ক্রোমোজোম তত্ত্ব**: মিয়োসিস বিভাজনের সময় সমসংস্থ ক্রোমোজোমের পৃথকীকরণ হুবহু মেন্ডেলের বংশগত উপাদানের পৃথকীকরণের সমান্তরাল। কিন্তু অনুমান আর প্রত্যক্ষ প্রমাণ এক নয়। জিনের ভৌত অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য প্রয়োজন ছিল সুনির্দিষ্ট পরীক্ষামূলক ভিত্তি।

সেই অকাট্য প্রমাণ রচিত হয়েছিল কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শেরমারহর্ন হলের ৬১১ নম্বর কক্ষে—১৬ বাই ২৩ ফুটের এক ঘিঞ্জি ও তীব্র গন্ধযুক্ত গবেষণাগার, যা বিজ্ঞান ইতিহাসে পরিচিত **দ্য ফ্লাই রুম** (The Fly Room) নামে। ভ্রূণতত্ত্ববিদ **টমাস হান্ট মরগান** (১৮৬৬–১৯৪৫) এবং তাঁর তিন প্রতিভাধর আন্ডারগ্র্যাজুয়েট ছাত্র—আলফ্রেড স্টার্টিভ্যান্ট, কেলভিন ব্রিজেস এবং হারম্যান জোসেফ মুলার—এই ছোট্ট ঘরটিতে বসেই আধুনিক ক্রোমোজোমীয় বংশগতিবিদ্যার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন।

## সাদা চোখের মাছি ও সেক্স লিংকেজ

মরগান তাঁর গবেষণার জন্য বেছে নিয়েছিলেন সাধারণ ফলমাছি **ড্রোসোফিলা মেলানোগ্যাস্টার** (*Drosophila melanogaster*)। জেনেটিক গবেষণার জন্য ড্রোসোফিলা ছিল এক নিখুঁত সৃষ্টি: কলার পুরানো কাঁচের বোতলে এদের খুব সহজে পালন করা যেত, পচা কলাই ছিল এদের প্রিয় খাদ্য, প্রতিটি মিলনে শত শত ডিম ফুটত এবং মাত্র ১০ থেকে ১২ দিনের মধ্যে এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে পৌঁছানো যেত। সবচেয়ে বড় সুবিধা ছিল, ড্রোসোফিলার কোষে মাত্র চার জোড়া ক্রোমোজোম বিদ্যমান।

টানা এক বছরেরও বেশি সময় ধরে মরগান অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে হাজার হাজার লাল চোখের বুনো মাছি পরীক্ষা করেন, কোনো নতুন মিউটেশন বা জিনের পরিবর্তনের আশায়। অবশেষে ১৯১০ সালের মে মাসে লাল চোখের হাজারো মাছির মাঝে তিনি একটিমাত্র পুরুষ মাছি খুঁজে পেলেন যার চোখ ছিল সম্পূর্ণ দুধের মতো সাদা। পরম যত্নে তিনি সেই সাদা চোখের পুরুষ মাছিটিকে আলাদা করে সাধারণ লাল চোখের স্ত্রী মাছির সাথে প্রজনন ঘটালেন।

প্রথম দৃষ্টিতে ফলাফল মেন্ডেলের সূত্রের মতোই দেখাচ্ছিল:

- প্রথম অপত্য প্রজন্ম ($F_1$): সকল পুরুষ ও স্ত্রী মাছির চোখ ছিল লাল, যা প্রমাণ করে লাল চোখের বৈশিষ্ট্যটি সাদা চোখের ওপর প্রকট।
- দ্বিতীয় অপত্য প্রজন্ম ($F_2$): প্রথম প্রজন্মের ভাই-বোনের মিলনে স্বাভাবিক ৩:১ ফিনোটাইপ অনুপাত (৩টি লাল চোখের মাছি বনাম ১টি সাদা চোখের মাছি) পাওয়া গেল।

কিন্তু যখন মরগান লিঙ্গের ভিত্তিতে মাছিগুলোকে আলাদা করলেন, তখন এক চমকপ্রদ সত্য উদঘাটিত হলো: *প্রতিটি সাদা চোখের মাছিই ছিল পুরুষ!* হাজার হাজার স্ত্রী মাছির মাঝে একটিও সাদা চোখের ছিল না; স্ত্রী মাছিগুলোর শতভাগই ছিল লাল চোখের, আর পুরুষ মাছিদের অর্ধেক ছিল লাল চোখের এবং অর্ধেক ছিল সাদা চোখের।

মরগান উপলব্ধি করলেন, এই ঘটনাটি কেবল তখনই সম্ভব যদি চোখের রঙ নির্ধারণকারী জিনটি কোষের **X সেক্স ক্রোমোজোমে** অবস্থান করে। স্ত্রী মাছির দুটি X ক্রোমোজোম ($XX$) থাকে, আর পুরুষ মাছির থাকে একটি X এবং একটি জিনগতভাবে নিষ্ক্রিয় Y ক্রোমোজোম ($XY$)। একটি স্ত্রী মাছির সাদা চোখ হতে হলে তার দুটি X ক্রোমোজোমেই প্রচ্ছন্ন মিউট্যান্ট অ্যালিল ($X^wX^w$) থাকতে হবে। কিন্তু পুরুষ মাছির যেহেতু একটিমাত্র X ক্রোমোজোম থাকে, তাই একটিমাত্র মিউট্যান্ট অ্যালিল পেলেই ($X^wY$) তার চোখ সাদা হতে বাধ্য। মানব ইতিহাসের এই প্রথমবার একটি নির্দিষ্ট মেন্ডেলীয় জিনকে কোষের দৃশ্যমান ক্রোমোজোমের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত করা সম্ভব হলো।

## ক্রসিং ওভার ও জেনেটিক ম্যাপিংয়ের সূচনা

ফ্লাই রুমের গবেষকরা যখন আরও ডজন ডজন মিউট্যান্ট জিন (যেমন ছোট ডানা, হলুদ শরীর, রক্তবর্ণ চোখ) আবিষ্কার করলেন, তখন দেখা গেল একই ক্রোমোজোমে অবস্থিত জিনগুলো মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রের মতো স্বাধীনভাবে চলাচল করে না। বরং তারা দলবদ্ধভাবে বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হতে চায়—এই ধর্মকে নাম দেওয়া হলো **জেনেটিক লিংকেজ** (Genetic Linkage)।

তবে এই লিংকেজ সবসময় সম্পূর্ণ ছিল না। একই X ক্রোমোজোমে থাকা দুটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে কাজ করার সময় দেখা গেল কিছু সংখ্যক অপত্যে পিতামাতার বৈশিষ্ট্যের নতুন সংমিশ্রণ (Recombination) ঘটেছে। মরগান ব্যাখ্যা করলেন, মায়োসিস বিভাজনের সময় হোমোলোগাস ক্রোমোজোম দুটি যখন কাছাকাছি আসে, তখন তাদের সুতোগুলো পরস্পরকে পেঁচিয়ে ধরে, ভেঙে যায় এবং নিজেদের অংশের বিনিময় ঘটায়—কোষবিদ্যায় যাকে বলা হয় *কায়াজমা* এবং বংশগতিতে বলা হয় **ক্রসিং ওভার** (Crossing Over)।

Shakil Mahmud • Research Monograph

১৯১১ সালের এক সন্ধ্যায় মরগানের আন্ডারগ্র্যাজুয়েট ছাত্র **আলফ্রেড স্টার্টিভ্যান্ট** (১৮৯১–১৯৭০) এক অপূর্ব গাণিতিক সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন। স্টার্টিভ্যান্ট বুঝলেন, ক্রোমোজোমের সুতোয় জিনগুলো যদি রৈখিকভাবে পুঁতির দানার মতো সাজানো থাকে, তবে দুটি জিনের মধ্যকার ক্রসিং ওভার ঘটার সম্ভাবনা নির্ভর করবে তাদের মধ্যবর্তী ভৌত দূরত্বের ওপর: দুটি জিন যত দূরে অবস্থিত হবে, তাদের মাঝে সুতো ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি।

> *“আমি বাড়িতে গেলাম এবং রাতের অধিকাংশ সময় ব্যয় করলাম (আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনার হোমওয়ার্ক বাদ দিয়ে) বিশ্বের প্রথম ক্রোমোজোম ম্যাপ তৈরির কাজে।”*
> *— আলফ্রেড স্টার্টিভ্যান্ট, এ হিস্ট্রি অব জেনেটিক্স (১৯৬৫)*

ড্রোসোফিলার ছয়টি সেক্স-লিংকড জিনের রিকম্বিনেশন হার বিশ্লেষণ করে স্টার্টিভ্যান্ট তৈরি করলেন পৃথিবীর প্রথম **জেনেটিক লিংকেজ ম্যাপ**। তিনি ১% রিকম্বিনেশন ফ্রিকোয়েন্সিকে নাম দিলেন ১ একক দূরত্ব (যা পরবর্তীতে মরগানের সম্মানে *সেন্টিমরগান* বা cM নামে ভূষিত হয়)। জিন আর কোনো বায়বীয় ধারণা রইল না: এটি ক্রোমোজোমের বুকে সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক ঠিকানাবিশিষ্ট একটি বাস্তব উপাদানে রূপান্তরিত হলো।

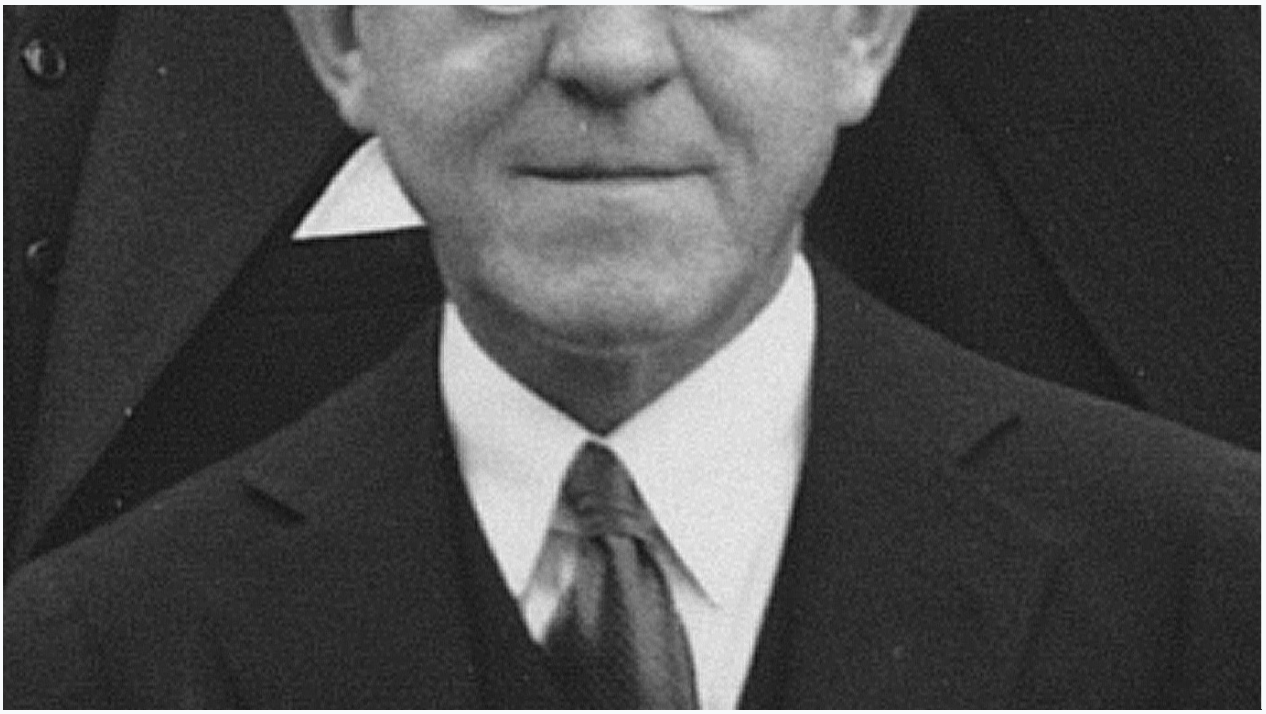
*সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "মাছি শিকারীদের গবেষণাগার — টমাস হান্ট মরগান, ড্রোসোফিলা ও ক্রোমোজোমীয় লিংকেজ"। জিনতত্ত্বের ইতিহাস, খণ্ড ২। https://shakilmahmud.com/bn/story-of-genetics-part-02-fly-room-morgan-drosophila-chromosomal-linkage-bn/*

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • তৃতীয় খণ্ড

# রূপান্তরক উপাদান — ফ্রেডেরিক গ্রিফিথ, অসওয়াল্ড অ্যাভেরি ও নিউমোকক্কাসের রহস্য

*রূপান্তরক উপাদান — ফ্রেডেরিক গ্রিফিথ, অসওয়াল্ড অ্যাভেরি ও নিউমোকক্কাসের রহস্য*

680 শব্দ • November 2, 2026 • ওয়েব সংস্করণ



**চিত্র ৩:** *অসওয়াল্ড অ্যাভেরি: ব্যাকটেরিয়ার রূপান্তর সূত্রের মাধ্যমে ডিএনএ যে বংশগতির বাহক তা প্রমাণকারী পুরোধা বিজ্ঞানী।*

১৯৩০-এর দশকে বংশগতির ক্রোমোজোম তত্ত্ব জীববিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত সত্যে পরিণত হয়েছিল। টমাস হান্ট মরগানের দল ক্রোমোজোমের বুকে শত শত জিনের সুনির্দিষ্ট অবস্থান চিহ্নিত করেছিলেন। কিন্তু এই সাফল্যের পেছনে লুকিয়ে ছিল আরও এক গভীর ও যন্ত্রণাদায়ক জৈব-রাসায়নিক রহস্য: *জিন আসলে কী দিয়ে তৈরি?* রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছিল ক্রোমোজোম মূলত দুটি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত: ক্ষারীয় প্রোটিন হিস্টোন এবং ফসফরাস সমৃদ্ধ এক অম্লীয় জৈব পলিমার, যার নাম **ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড (ডিএনএ)**। দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দী ধরে বিজ্ঞানীদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে প্রোটিনই বংশগতির বাহক। প্রোটিন বিশটি ভিন্ন ভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিড দিয়ে গঠিত, যার রয়েছে জটিল ত্রিমাত্রিক ভাঁজ এবং বিপুল পরিমাণ তথ্য ধারণ করার অসীম ক্ষমতা। অন্যদিকে ফোবাস লেভিনের ভুল **টেট্রানিউক্লিওটাইড হাইপোথিসিস**-এর কারণে বিজ্ঞানীরা মনে করতেন ডিএনএ হলো মাত্র চারটি নিউক্লিওটাইডের (এডেনিন, থাইমিন, গুয়ানিন, সাইটোসিন) একঘেয়ে পুনরাবৃত্তিমূলক এক পলিমার—যা কেবল প্রোটিনকে ধরে রাখার নিষ্ক্রিয় কঙ্কাল হিসেবে কাজ করে।

এই সর্বজনীন ভুল ধারণায় প্রথম আঘাত হানেন ব্রিটিশ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের এক নিঃসঙ্গ মেডিকেল অফিসার **ফ্রেডেরিক গ্রিফিথ** (১৮৭৯–১৯৪১), যিনি নিউমোনিয়া মহামারীর কারণ অনুসন্ধান করছিলেন।

Shakil Mahmud • Research Monograph

## গ্রিফিথের রূপান্তর পরীক্ষা (১৯২৮)

গ্রিফিথ *স্ট্রেপ্টোকক্কাস নিউমোনি* (Streptococcus pneumoniae) ব্যাকটেরিয়ার দুটি ভিন্ন স্ট্রেইন নিয়ে কাজ করছিলেন:

- **মসৃণ বা এস-স্ট্রেইন (Smooth Strain):** পেট্রিডিশে এদের কলোনি ছিল চকচকে ও মসৃণ। এই ব্যাকটেরিয়ার চারপাশে পলিস্যাকারাইড শর্করার এক সুরক্ষাকারী ক্যাপসুল থাকত, যা ইঁদুরের শ্বেত রক্তকণিকার আক্রমণ থেকে ব্যাকটেরিয়াকে রক্ষা করত। ফলে জীবন্ত এস-ব্যাকটেরিয়া ইঁদুরের শরীরে প্রবেশ করালে দ্রুত নিউমোনিয়া হয়ে ইঁদুর মারা যেত।
- **অমসৃণ বা আর-স্ট্রেইন (Rough Strain):** এদের কলোনি ছিল খসখসে। একটি জিনগত মিউটেশনের কারণে এরা ক্যাপসুল তৈরি করতে পারত না; ফলে ইঁদুরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা এদের সহজেই ধ্বংস করে ফেলত এবং ইঁদুর সুস্থ থাকত।

গ্রিফিথ যখন তাপে মৃত এস-স্ট্রেইন ব্যাকটেরিয়া ইঁদুরে প্রবেশ করালেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই ইঁদুর বেঁচে রইল, কারণ তাপের কারণে ব্যাকটেরিয়াগুলো মারা গিয়েছিল। কিন্তু এরপর গ্রিফিথ এক অদ্ভুত পরীক্ষা চালালেন: তিনি *তাপে মৃত এস-স্ট্রেইন* এবং *সম্পূর্ণ নিরীহ জীবন্ত আর-স্ট্রেইন* ব্যাকটেরিয়া একসাথে মিশিয়ে ইঁদুরের শরীরে ইনজেকশন দিলেন।

ফলাফল দেখে গ্রিফিথ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। মিশ্রণটি দেওয়ার পর সুস্থ ইঁদুরগুলো মারাত্মক নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেল। মৃত ইঁদুরের রক্ত পরীক্ষা করে তিনি দেখলেন সেখানে কোনো নিরীহ আর-ব্যাকটেরিয়া নেই, বরং রক্তে কিলবিল করছে কোটি কোটি **জীবন্ত ও ক্যাপসুলযুক্ত মসৃণ এস-স্ট্রেইন ব্যাকটেরিয়া**! মৃত ব্যাকটেরিয়ার শরীর থেকে কোনো এক অজানা উপাদান নিরীহ জীবিত ব্যাকটেরিয়ার ভেতরে প্রবেশ করে তাকে চিরতরে রূপান্তর করে ফেলেছে। গ্রিফিথ এই রহস্যময় উপাদানের নাম দিলেন **ট্রান্সফরমিং প্রিন্সিপল** (Transforming Principle বা রূপান্তরক উপাদান)। শুধু তাই নয়, রূপান্তরিত এই ব্যাকটেরিয়ার বংশধরেরাও ক্যাপসুলযুক্ত হয়ে জন্ম নিল—যা প্রমাণ করল এটি একটি স্থায়ী ও বংশগত পরিবর্তন।

## অ্যাভেরি, ম্যাকলয়েড ও ম্যাককার্টির মহাবিপ্লব (১৯৪৪)

১৯৪১ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসি বিমান হামলায় গ্রিফিথ তাঁর লন্ডনের গবেষণাগারে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি জেনে যেতে পারেননি তাঁর সেই রূপান্তরকারী উপাদানের আসল পরিচয়। নিউ ইয়র্কের রকফেলার ইনস্টিটিউটের কঠোর সাধক বিজ্ঞানী **অসওয়াল্ড টি. অ্যাভেরি** (১৮৭৭–১৯৫৫) এবং তাঁর দুই তরুণ সহযোগী **কলিন ম্যাকলয়েড** ও **ম্যাকলিন ম্যাককার্টি** এই রহস্য উন্মোচনে আত্মনিয়োগ করেন।

টানা দশ বছর ধরে তাঁরা লিটার লিটার কালচার থেকে মৃত এস-ব্যাকটেরিয়ার নির্যাস বিশুদ্ধ করতে লাগলেন। তাঁরা রাসায়নিকভাবে শর্করা ও চর্বি দূর করলেন এবং অ্যালকোহল দিয়ে সক্রিয় উপাদানটিকে আলাদা করলেন। এই উপাদানটি এতটাই শক্তিশালী ছিল যে দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ উপস্থিত থাকলেও তা রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম হতো।

উপাদানটির প্রকৃত স্বরূপ নিশ্চিত করতে তাঁরা একে বিভিন্ন এনজাইম দিয়ে বিশ্লেষণ করলেন:

- **ট্রিপসিন ও কাইমোট্রিপসিন (প্রোটিয়েজ):** যা সমস্ত প্রোটিনকে ভেঙে চুরমার করে দেয়। প্রোটিন ধ্বংস করার পরও রূপান্তরক ক্ষমতা শতভাগ বজায় রইল।
- **রাইবোনিউক্লিয়েজ (RNase):** যা সমস্ত আরএনএ ধ্বংস করে। আরএনএ ধ্বংস করার পরও রূপান্তরক ক্ষমতায় কোনো প্রভাব পড়ল না।
- **ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিয়েজ (DNase):** একটি নতুন আবিষ্কৃত এনজাইম যা কেবল ডিএনএকে ভেঙে টুকরো করে দেয়। *ডিএনএ-ধ্বংসকারী এই এনজাইম প্রয়োগ করার সাথে সাথে রূপান্তরক ক্ষমতা সম্পূর্ণ ও চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে গেল!*

রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা গেল এই উপাদানটিতে নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের অনুপাত ১.৬৭ : ১—যা হুবহু ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিডের (DNA) গঠনের সাথে মিলে যায় এবং প্রোটিনের ক্ষেত্রে যা অসম্ভব।

> *“যদি আমাদের সিদ্ধান্ত সঠিক হয়ে থাকে—যদিও তা এখনো চূড়ান্ত প্রমাণিত নয়—তবে এর অর্থ হলো নিউক্লিক অ্যাসিড কেবল কাঠামোগত কোনো উপাদান নয়, বরং কোষের জৈব রাসায়নিক কার্যকলাপ ও বংশগত বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের প্রধান সক্রিয় চালিকাশক্তি।”*
> *— অসওয়াল্ড অ্যাভেরি, ভাই রয় অ্যাভেরিকে লেখা চিঠি (১৯৪৩)*

১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে *জার্নাল অব এক্সপেরিমেন্টাল মেডিসিন*-এ প্রকাশিত তাঁদের এই গবেষণাপত্র প্রমাণ করল যে বংশগতির মূল উপাদান ডিএনএ। কিন্তু বিজ্ঞান মহল তখনও দ্বিধান্বিত ছিল; বহু বিজ্ঞানী যুক্তি দেখালেন যে অ্যাভেরির নমুনায় হয়তো ০.১% অদৃশ্য প্রোটিন ছিল যা আসল রূপান্তর ঘটিয়েছে। বিজ্ঞানের বিশ্ব তখন আরও এক অপ্রতিরোধ্য, নাটকীয় প্রমাণের প্রতীক্ষায় ছিল।

*সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "রূপান্তরক উপাদান — ফ্রেডেরিক গ্রিফিথ, অসওয়াল্ড অ্যাভেরি ও নিউমোকক্কাসের রহস্য"। জিনতত্ত্বের ইতিহাস, খণ্ড ৩। https://shakilmahmud.com/bn/story-of-genetics-part-03-transforming-principle-griffith-avery-pneumococcus-bn/*

Shakil Mahmud • Research Monograph

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • চতুর্থ খণ্ড

# ব্লেন্ডার পরীক্ষা — অ্যালফ্রেড হার্শি, মার্থা চেজ ও ব্যাকটেরিওফাযের ফসফরাস নিউক্লিয়াস

*ব্লেন্ডার পরীক্ষা — অ্যালফ্রেড হার্শি, মার্থা চেজ ও ব্যাকটেরিওফাযের ফসফরাস নিউক্লিয়াস*

650 শব্দ • November 2, 2026 • ওয়েব সংস্করণ

❖



**চিত্র ৪:** *অ্যালফ্রেড হার্শি ও মার্থা চেজ: ব্যাকটেরিওফায ও ব্লেন্ডার পরীক্ষার মাধ্যমে ডিএনএ-এর বংশগত উপাদান হিসেবে চূড়ান্ত স্বীকৃতি।*

১৯৪৪ সালে অসওয়াল্ড অ্যাভেরি ব্যাকটেরিয়ার রূপান্তরের মাধ্যমে ডিএনএ-র ভূমিকা প্রমাণ করা সত্ত্বেও বিশ্বখ্যাত রসায়নবিদদের মাঝে সংশয় থেকেই গিয়েছিল। অনেকে যুক্তি দিচ্ছিলেন যে নিউমোকক্কাসের রূপান্তর হয়তো ব্যাকটেরিয়ার একটি ব্যতিক্রমী আচরণ, অথবা অ্যাভেরির ডিএনএ নমুনায় লেগে থাকা অতি সূক্ষ্ম প্রোটিনই হয়তো আসল বংশগতির সংকেত বহন করছে। এই বিজ্ঞানীদের মন থেকে সংশয়ের শেষ ধূলিকণাটুকু মুছে ফেলার জন্য প্রয়োজন ছিল অতি সাধারণ এক জৈবিক মাধ্যম—যেখানে জটিল কোষীয় প্রক্রিয়ার কোনো বিভ্রান্তি থাকবে না, থাকবে কেবল প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিডের চরম দ্বৈততা। সেই আদর্শ হাতিয়ারটি পাওয়া গেল ব্যাকটেরিয়ার ঘাতক এক অদ্ভুত ভাইরাসের মধ্যে: যার নাম **ব্যাকটেরিওফায** (Bacteriophage)।

ম্যাক্স ডেলব্রুক ও সালভাদর লুরিয়ার প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত “ফায গ্রুপ”-এর গবেষকরা *ইশেরিকিয়া কোলাই* (E. coli) ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণকারী **T2 ব্যাকটেরিওফায** নিয়ে কাজ করছিলেন। সদ্য আবিষ্কৃত ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের নিচে এই T2 ফাযকে দেখতে লাগত ঠিক চাঁদে নামা চন্দ্রযানের মতো: একটি ত্রিমাত্রিক প্রোটিন নির্মিত বহুতলক মাথা, যার ভেতরে ঘন হয়ে পেঁচিয়ে থাকে ডিএনএ, এবং নিচে একটি সংকোচনশীল লেজ ও কিছু সংবেদনশীল তন্তু। রাসায়নিকভাবে T2 ফায ছিল পরম বিশুদ্ধ: এর ঠিক ৫০%

ছিল প্রোটিন এবং ৫০% ছিল ডিএনএ। যখন একটি ফায ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করে, সে তার লেজ দিয়ে ব্যাকটেরিয়ার গায়ে বসে পড়ে এবং মাত্র বিশ মিনিট পর ব্যাকটেরিয়াটি বিদীর্ণ হয়ে সেখান থেকে শত শত নতুন ফায বের হয়ে আসে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, ব্যাকটেরিয়াকে হুকুম দেওয়ার জন্য তার ভেতরে কে প্রবেশ করে: বাইরের প্রোটিনের আবরণ, নাকি ভেতরের ডিএনএ?

## তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের লড়াই: ৩২-ফসফরাস বনাম ৩৫-সালফার

১৯৫২ সালের গ্রীষ্মে নিউ ইয়র্কের কোল্ড স্প্রিং হারবার ল্যাবরেটরিতে জেনেটিসিস্ট **অ্যালফ্রেড হার্শি** (১৯০৮–১৯৯৭) এবং তাঁর চব্বিশ বছর বয়সী প্রতিভাবান সহকারী **মার্থা চেজ** (১৯২৭–২০০৩) এক অবিস্মরণীয় সুন্দর পরীক্ষা পরিচালনা করলেন। তাঁদের পরীক্ষার ভিত্তি ছিল প্রোটিন ও ডিএনএ-র রাসায়নিক মৌলের একটি মৌলিক পার্থক্য:

- **ফসফরাস ($^{32}textP$):** ডিএনএ-র কাঠামো গঠিত হয় বিপুল পরিমাণ ফসফেট দিয়ে, অথচ প্রোটিনে কোনো ফসফরাস থাকে না।
- **সালফার ($^{35}textS$):** মিথিওনিন ও সিস্টিন অ্যামিনো অ্যাসিডের কারণে প্রোটিনে প্রচুর সালফার থাকে, অথচ ডিএনএ-র অণুতে কোনো সালফার পরমাণু থাকে না।

হার্শি ও চেজ তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ দিয়ে দুই ধরণের T2 ফায প্রস্তুত করলেন:

1. প্রথম ব্যাচকে বড় করা হলো তেজস্ক্রিয় ফসফরাস-৩২ ($^{32}textP$) সমৃদ্ধ কালচারে, যার ফলে ভাইরাসের **ডিএনএ তেজস্ক্রিয়** হয়ে উঠল কিন্তু প্রোটিন রইল স্বাভাবিক।
2. দ্বিতীয় ব্যাচকে বড় করা হলো তেজস্ক্রিয় সালফার-৩৫ ($^{35}textS$) সমৃদ্ধ কালচারে, যার ফলে ভাইরাসের **প্রোটিন কোট তেজস্ক্রিয়** হয়ে উঠল কিন্তু ডিএনএ রইল স্বাভাবিক।

## ওয়ারিং ব্লেন্ডার ও সেন্ট্রিফিউজ

এরপর তাঁরা সাধারণ ব্যাকটেরিয়ার ওপর এই দুই ধরণের তেজস্ক্রিয় ভাইরাসকে ছেড়ে দিলেন। ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করার সাথে সাথে একটি যান্ত্রিক সমস্যার সৃষ্টি হলো: ব্যাকটেরিয়ার শরীরের বাইরে লেগে থাকা ভাইরাসের খালি খোসাগুলোকে ব্যাকটেরিয়াকে না মেরে কীভাবে আলাদা করা যাবে?

এই সমস্যার সমাধানে তাঁরা ব্যবহার করলেন বিজ্ঞানের ইতিহাসের সবচেয়ে বিখ্যাত গৃহস্থালি সামগ্রী: একটি সাধারণ **ওয়ারিং রান্নাঘরের ব্লেন্ডার** (Waring Kitchen Blender)। সংক্রামিত ব্যাকটেরিয়া মিশ্রণটিকে ব্লেন্ডারে দিয়ে তীব্র গতিতে মাত্র কয়েক মিনিট ঘোরাতেই ব্লেন্ডারের তরল ঘূর্ণি ব্যাকটেরিয়ার গা থেকে ভাইরাসের খালি খোলসগুলোকে ছিঁড়ে আলাদা করে দিল, অথচ ব্যাকটেরিয়া কোষের কোনো ক্ষতি হলো না।

এরপর সেই মিশ্রণটিকে সেন্ট্রিফিউজ মেশিনে দিয়ে দ্রুত ঘোরানো হলো। ভরের পার্থক্যের কারণে উপাদানগুলো সুন্দরভাবে আলাদা হয়ে গেল:

- ভারী ব্যাকটেরিয়া কোষগুলো টেস্টটিউবের তলায় জমা হয়ে একটি কঠিন পিণ্ড বা **পেলেট** (Pellet) তৈরি করল।
- ছিঁড়ে যাওয়া হালকা ভাইরাসের খোলসগুলো উপরের তরল অংশে বা **সুপারন্যাট্যান্ট** (Supernatant)-এ ভেসে রইল।

## গাইগার কাউন্টারের রায়

যখন হার্শি ও চেজ গাইগার কাউন্টার দিয়ে দুই অংশের তেজস্ক্রিয়তা পরিমাপ করলেন, ফলাফল এলো দিনের আলোর মতো স্পষ্ট:

Shakil Mahmud • Research Monograph

- সালফার-৩৫ পরীক্ষায় (প্রোটিন লেবেলযুক্ত), প্রায় **৮০% তেজস্ক্রিয়তা পাওয়া গেল উপরের তরল অংশে**। অর্থাৎ প্রোটিন খোলস কখনোই ব্যাকটেরিয়ার ভেতরে প্রবেশ করেনি; তা বাইরেই সিরিঞ্জের মতো পড়ে ছিল।
- ফসফরাস-৩২ পরীক্ষায় (ডিএনএ লেবেলযুক্ত), **৭০% এরও বেশি তেজস্ক্রিয়তা পাওয়া গেল তলায় জমে থাকা ব্যাকটেরিয়ার পেলেটের ভেতরে**। অর্থাৎ ভাইরাসের ডিএনএ ব্যাকটেরিয়ার দেয়াল ভেদ করে ভেতরে ঢুকে গেছে।

সবচেয়ে বড় কথা, তলার ব্যাকটেরিয়াগুলোকে যখন ফুটতে দেওয়া হলো, তখন দেখা গেল উৎপন্ন নতুন শিশু ভাইরাসগুলোর শরীরেও তেজস্ক্রিয় ফসফরাস বিদ্যমান—যা প্রমাণ করে পিতামাতার ডিএনএ সরাসরি পরবর্তী প্রজন্মে স্থানান্তরিত হয়েছে।

১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বরে *জার্নাল অব জেনারেল ফিজিওলজি*-তে প্রকাশিত এই "ব্লেন্ডার পরীক্ষা" প্রোটিন তত্ত্বের কফিনে শেষ পেরেকটি ঠুকে দিল। বিশ্বের তাবৎ জীববিজ্ঞানী অবশেষে মেনে নিলেন: ডিএনএ-ই হলো জীবনের সার্বজনীন বংশগতির ধারক। সাথে সাথে বিজ্ঞানের সমস্ত দৃষ্টি ঘুরে গেল এক পরম প্রশ্নের দিকে: *এই ডিএনএ অণুর ভেতরের গঠন কেমন, যা চারশো কোটি বছর ধরে জীবনের নীলনকশাকে সযত্নে লিখে রেখেছে?*

*সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "ব্লেন্ডার পরীক্ষা — অ্যালফ্রেড হার্শি, মার্থা চেজ ও ব্যাকটেরিওফাযের ফসফরাস নিউক্লিয়াস"। জিনতত্ত্বের ইতিহাস, খণ্ড ৪। https://shakilmahmud.com/bn/story-of-genetics-part-04-blender-experiment-hershey-chase-bacteriophage-core-bn/*

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • পঞ্চম খণ্ড

# বংশগতির জ্যামিতি — রোজালিন্ড ফ্র্যাঙ্কলিন, মরিস উইলকিন্স, ওয়াটসন, ক্রিক ও ডাবল হেলিক্স

*বংশগতির জ্যামিতি — রোজালিন্ড ফ্র্যাঙ্কলিন, মরিস উইলকিন্স, ওয়াটসন, ক্রিক ও ডাবল হেলিক্স*

585 শব্দ • November 2, 2026 • ওয়েব সংস্করণ



**চিত্র ৫:** *রোজালিন্ড ফ্র্যাঙ্কলিন: এক্স-রে ক্রিস্টালোগ্রাফির 'ফটো ৫১' এর মাধ্যমে ডিএনএর হেলিক্যাল কাঠামো উন্মোচনকারী কিংবদন্তি গবেষক।*

১৯৫৩ সালের সূচনালগ্নে আণবিক জীববিজ্ঞানের মূল প্রশ্ন আর এটি ছিল না যে ডিএনএ বংশগতির উপাদান কি না; আসল প্রশ্ন ছিল ডিএনএ-র *ত্রিমাত্রিক জ্যামিতিক গঠন কেমন*—যা একদিকে কোটি কোটি জৈবিক তথ্য ধারণ করতে পারে, আবার অন্যদিকে প্রতিবার কোষ বিভাজনের সময় সেই বিপুল তথ্যকে বিন্দুমাত্র ভুল ছাড়াই হুবহু নকল (Replication) করতে পারে। এই পরম রহস্যের সমাধানে কেমব্রিজের ক্যাভেন্ডিশ ল্যাবরেটরি ও লন্ডনের কিংস কলেজের চারজন ক্ষণজন্মা গবেষক জড়িয়ে পড়েছিলেন এক শ্বাসরুদ্ধকর প্রতিযোগিতায়: **জেমস ওয়াটসন** (মাত্র চব্বিশ বছর বয়সী আমেরিকান তরুণ বিজ্ঞানী), **ফ্রান্সিস ক্রিক** (ছত্রিশ বছর বয়সী ব্রিটিশ পদার্থবিদ), **মরিস উইলকিন্স** (কিংস কলেজের বায়োফিজিসিস্ট) এবং **রোজালিন্ড ফ্র্যাঙ্কলিন** (এক্স-রে ক্রিস্টালোগ্রাফির অসামান্য প্রতিভাধর ভৌত রসায়নবিদ)।

## তিনটি মূল সূত্র: চারগাফের সূত্র ও ফটো ৫১

ডিএনএ-র জটিল ধাঁধার জট খুলতে তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রমাণের মেলবন্ধন ঘটেছিল:

Shakil Mahmud • Research Monograph

1. **চারগাফের সমতা সূত্র (১৯৫০):** অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান বংশোদ্ভূত জৈব রসায়নবিদ আরউইন চারগাফ বিভিন্ন প্রাণীর ডিএনএ বিশ্লেষণ করে আবিষ্কার করেন যে—কোনো ডিএনএ নমুনায় এডেনিনের পরিমাণ সবসময় থাইমিনের সমান ($A = T$), এবং গুয়ানিনের পরিমাণ সবসময় সাইটোসিনের সমান ($G = C$)। অর্থাৎ পিউরিন ও পিরিমিডিনের অনুপাত সর্বদা ১:১। চারগাফ নিজে এই সমতার পেছনের জ্যামিতিক তাৎপর্য বুঝতে পারেননি।
2. **ফ্র্যাঙ্কলিনের অমর ‘ফটো ৫১’:** কিংস কলেজে রোজালিন্ড ফ্র্যাঙ্কলিন আবিষ্কার করেন যে ডিএনএ আর্দ্রতার ওপর ভিত্তি করে দুটি ভিন্ন রূপ ধারণ করে: শুষ্ক কেলাসাকার ‘A’ রূপ এবং জলীয় ‘B’ রূপ। ১৯৫২ সালের মে মাসে আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করে একটিমাত্র বি-ডিএনএ তন্তুর ওপর টানা ৬২ ঘণ্টা এক্স-রে রশ্মি ফেলে ফ্র্যাঙ্কলিন যে বিচ্ছুরণ প্যাটার্ন ধারণ করেছিলেন, তা ইতিহাসে পরিচিত **ফটো ৫১** নামে। সেই ছবিতে সুস্পষ্ট একটি $X$-আকৃতির প্যাটার্ন দেখা যাচ্ছিল—যা হেলিক্স বা সর্পিল কাঠামোর অকাট্য প্রমাণ। প্যাটার্নটি বলে দিচ্ছিল হেলিক্সের প্রতিটি প্যাঁচের দৈর্ঘ্য ৩৪ অ্যাংস্ট্রম ($৩.৪ textnm$) এবং পাশাপাশি দুটি ক্ষারের মধ্যকার দূরত্ব ৩.৪ অ্যাংস্ট্রম ($০.৩৪ textnm$)।
3. **অ্যান্টিপ্যারালাল বিন্যাস:** ফ্র্যাঙ্কলিনের ক্রিস্টালোগ্রাফিক তথ্য বিশ্লেষণ করে ফ্রান্সিস ক্রিক তাঁর গভীর পদার্থবিজ্ঞানের জ্ঞান দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন যে ডিএনএ-র দুটি সুতো একই দিকে সমান্তরালভাবে চলতে পারে না; বরং তারা **অ্যান্টিপ্যারালাল বা বিপরীত-সমান্তরালভাবে** চলে—একটি সুতো 5′ rightarrow 3’ মুখী হলে অপর সুতোটি হবে 3′ rightarrow 5’ মুখী।

## কার্ডবোর্ডের মডেল ও আণবিক বিপ্লব

আমেরিকার কিংবদন্তি রসায়নবিদ লাইナス পলিং ভুলবশত ডিএনএ-র একটি ট্রিপল-হেলিক্স বা তিন-সুতার মডেল প্রস্তাব করেছিলেন, যার ফসফেট মেরুদণ্ড ছিল ভেতরের দিকে। ওয়াটসন ও ক্রিক বুঝলেন তা অসম্ভব, কারণ শারীরবৃত্তীয় pH-এ ফসফেটের ঋণাত্মক চার্জগুলো একে অপরকে তীব্রভাবে বিকর্ষণ করবে। তাই ফসফেটের মেরুদণ্ড থাকতে হবে বাইরে জলীয় পরিবেশের দিকে, আর নাইট্রোজেন ক্ষারগুলো লুকানো থাকবে ভেতরে।

১৯৫৩ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি সকালে ক্যাভেন্ডিশ ল্যাবরেটরির অস্টিন উইংয়ে বসে জেমস ওয়াটসন শক্ত কার্ডবোর্ড কেটে চারটি ক্ষারের মডেল তৈরি করছিলেন। আমেরিকান ভৌত রসায়নবিদ জেরি ডনোহুর পরামর্শে তিনি পাঠ্যপুস্তকের ভুল ‘এনল’ রূপের বদলে সঠিক ‘কিটো’ রূপের গুয়ানিন ও থাইমিন ব্যবহার করলেন।

টেবিলের ওপর কার্ডবোর্ডের টুকরোগুলো নাড়াচাড়া করতে গিয়ে ওয়াটসন হঠাৎ এক অপূর্ব প্রাকৃতিক সামঞ্জস্যের মুখোমুখি হলেন:

- দুটি হাইড্রোজেন বন্ধনযুক্ত একটি এডেনিন-থাইমিন ($A - T$) জোড়ার সামগ্রিক জ্যামিতিক আয়তন হুবহু তিনটি হাইড্রোজেন বন্ধনযুক্ত গুয়ানিন-সাইটোসিন ($G - C$) জোড়ার সমান!
- একটি বড় দ্বিবলয় পিউরিন ক্ষার ($A$ বা $G$) সবসময় একটি ছোট একবলয় পিরিমিডিন ক্ষারের ($T$ বা $C$) সাথে জোড়া বাঁধে, যার ফলে পুরো হেলিক্স জুড়ে ব্যাস সর্বদা নিখুঁতভাবে ২০ অ্যাংস্ট্রম ($২.০ textnm$) বজায় থাকে।

> *“আমরা যে নির্দিষ্ট ক্ষার জোড়ের কথা উল্লেখ করেছি, তা তাৎক্ষণিকভাবে বংশগতির উপাদানের হুবহু অনুলিপিকরণের একটি সহজ প্রক্রিয়ার ইঙ্গিত দেয়—যা আমাদের দৃষ্টি এড়ায়নি।”*
> *— জেমস ওয়াটসন ও ফ্রান্সিস ক্রিক, নেচার (২৫ এপ্রিল ১৯৫৩)*

সেদিন দুপুরে কেমব্রিজের ঈগল পাবে গিয়ে ওয়াটসন ও ক্রিক বন্ধুদের জানিয়েছিলেন যে তাঁরা “জীবনের রহস্য খুঁজে পেয়েছেন।” ১৯৫৩ সালের ২৫ এপ্রিল *নেচার* পত্রিকায় মাত্র ৯০০ শব্দের ঐতিহাসিক আর্টিকেলে ওয়াটসন ও ক্রিক তাঁদের **অ্যান্টিপ্যারালাল বি-ডিএনএ ডাবল হেলিক্স** মডেল প্রকাশ করেন। উন্মোচিত হলো যে বংশগতির ভাষা লেখা থাকে এই ক্ষারজোড়ের রৈখিক শৃঙ্খলে; আর

একটি সুতো অপরটির পরিপূরক হওয়ায় সুতো দুটি আলাদা হয়ে গেলেই প্রতিটি সুতো নতুন একটি পরিপূরক সুতো তৈরির ছাঁচ হিসেবে কাজ করে। বিজ্ঞান প্রবেশ করল এক নতুন যুগে।

*সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "বংশগতির জ্যামিতি — রোজালিন্ড ফ্র্যাঙ্কলিন, মরিস উইলকিন্স, ওয়াটসন, ক্রিক ও ডাবল হেলিক্স"। জিনতত্ত্বের ইতিহাস, খণ্ড ৫। https://shakilmahmud.com/bn/story-of-genetics-part-05-geometry-heredity-franklin-watson-crick-double-helix-bn/*

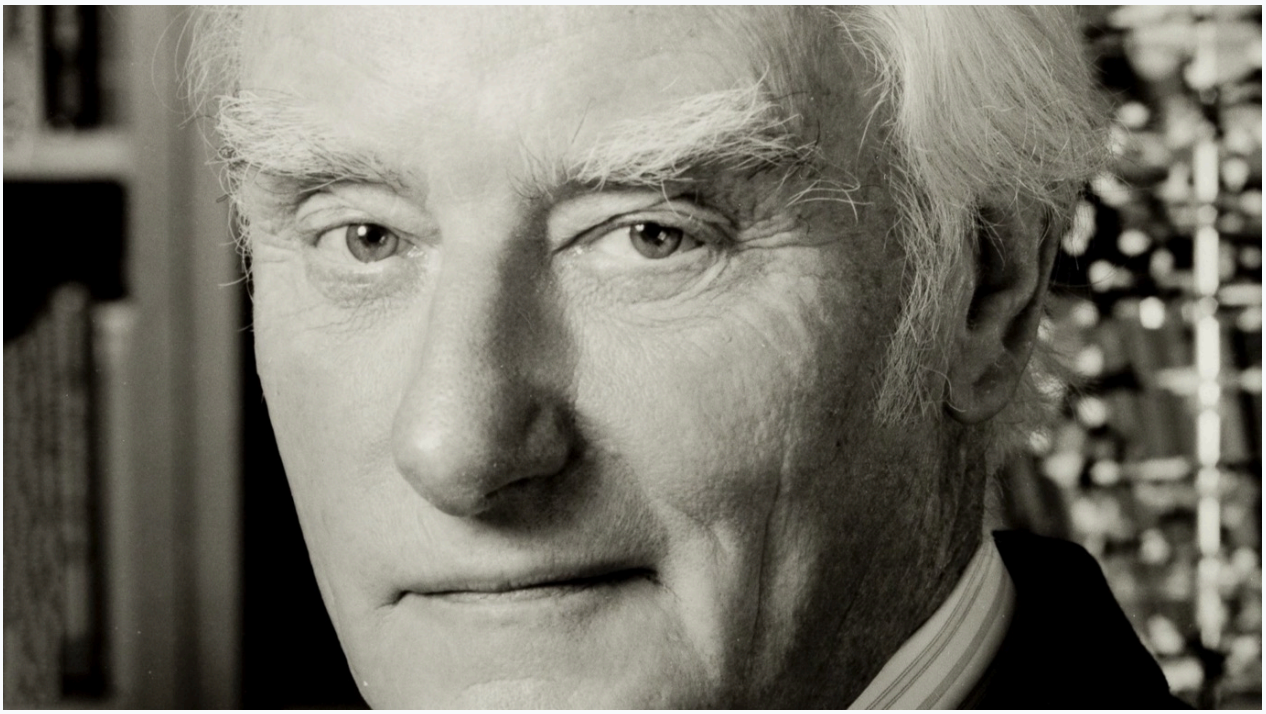
Shakil Mahmud • Research Monograph

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • ষষ্ঠ খণ্ড

# সেন্ট্রাল ডগমা — ফ্রান্সিস ক্রিক, অ্যাডাপ্টার অণু ও তথ্যের একমুখী প্রবাহ

*সেন্ট্রাল ডগমা — ফ্রান্সিস ক্রিক, অ্যাডাপ্টার অণু ও তথ্যের একমুখী প্রবাহ*

568 শব্দ • November 2, 2026 • ওয়েব সংস্করণ



**চিত্র ৬:** *ফ্রান্সিস ক্রিক: ডিএনএ ডাবল হেলিক্সের সহ-আবিষ্কারক ও আণবিক জীববিজ্ঞানের সেন্ট্রাল ডগমার রূপকার।*

১৯৫৩ সালে ডাবল হেলিক্সের আবিষ্কার ডিএনএ রেপ্লিকেশনের ভৌত রূপরেখা পরিষ্কার করেছিল ঠিকই, কিন্তু সাথে সাথেই জন্ম দিয়েছিল এক গভীরতর জৈব-ভৌত ধাঁধার: *কোষের নিউক্লিয়াসে থাকা মাত্র চারটি ক্ষারের একমাত্রিক রৈখিক শৃঙ্খল কীভাবে সাইটোপ্লাজমে হাজার হাজার জটিল ত্রিমাত্রিক এনজাইম ও প্রোটিনের গঠন পরিচালনা করে?* ডিএনএ ছিল কেবল তথ্যের নিষ্ক্রিয় টেপ; আর প্রোটিন ছিল কোষের সক্রিয় বিপাকীয় কর্মী। এই দুই ভিন্ন আণবিক জগতের মাঝে ছিল এক বিরাট তাত্ত্বিক শূন্যতা। সেই শূন্যতা প্রায় একক দক্ষতায় পূরণ করেছিলেন তাত্ত্বিক জীববিজ্ঞানের মহান রূপকার **ফ্রান্সিস ক্রিক** (১৯১৬–২০০৪)।

## সিকোয়েন্স হাইপোথিসিস (১৯৫৮)

১৯৫৭ সালের সেপ্টেম্বরে সোসাইটি ফর এক্সপেরিমেন্টাল বায়োলজিতে প্রদত্ত এক ঐতিহাসিক বক্তৃতায় (যা ১৯৫৮ সালে *অন প্রোটিন সিন্থেসিস* নামে প্রকাশিত হয়), ক্রিক দুটি যুগান্তকারী মূলনীতি প্রস্তাব করেন যা আধুনিক জীববিজ্ঞানের ভিত্তিপ্রস্তর হয়ে ওঠে।

প্রথমটি ছিল **সিকোয়েন্স হাইপোথিসিস** (Sequence Hypothesis)। তৎকালীন প্রচলিত অস্পষ্ট ধারণাগুলোকে নাকচ করে ক্রিক দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করলেন:

> *“সিকোয়েন্স হাইপোথিসিস ধরে নেয় যে নিউক্লিক অ্যাসিডের বৈশিষ্ট্য কেবল তার ক্ষারসমূহের রৈখিক অনুক্রমের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়, এবং এই ক্ষারানুক্রম হলো একটি নির্দিষ্ট প্রোটিনের অ্যামিনো অ্যাসিড অনুক্রমের এক সরল সংকেত বা কোড।”*
> *— ফ্রান্সিস ক্রিক, অন প্রোটিন সিন্থেসিস (১৯৫৮)*

ক্রিক আরও বললেন, একটি প্রোটিনের অ্যামিনো অ্যাসিডের রৈখিক শৃঙ্খলের মধ্যেই তার স্বয়ংক্রিয়ভাবে ত্রিমাত্রিক গঠনের ভাঁজ নেওয়ার সমস্ত তথ্য নিহিত থাকে—যা পরবর্তীতে ক্রিশ্চিয়ান অ্যানফিনসেনের নোবেলজয়ী পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছিল।

## সেন্ট্রাল ডগমার প্রকৃত স্বরূপ

দ্বিতীয় নীতিটি ছিল ক্রিকের সর্বাধিক আলোচিত এবং পাঠ্যপুস্তকে সবচেয়ে বেশি ভুলভাবে উপস্থাপিত তত্ত্ব: **সেন্ট্রাল ডগমা** (The Central Dogma)। অধিকাংশ বইয়ে সেন্ট্রাল ডগমাকে কেবল একটি সরল রাসায়নিক তীরচিহ্ন হিসেবে দেখানো হয়: $text{DNA} rightarrow text{RNA} rightarrow text{}$প্রোটিন। কিন্তু ক্রিকের মূল দর্শনটি ছিল মূলত *তথ্য তত্ত্ব এবং সংকেত প্রবাহের একমুখীতা* নিয়ে:

> *“আণবিক জীববিজ্ঞানের সেন্ট্রাল ডগমা রৈখিক তথ্যের অবিকল স্থানান্তর নিয়ে আলোচনা করে। এটি ঘোষণা করে যে তথ্য একবার প্রোটিনে স্থানান্তরিত হয়ে গেলে তা আর কখনোই প্রোটিন থেকে পুনরায় প্রোটিনে বা নিউক্লিক অ্যাসিডে ফিরে যেতে পারে না।”*
> *— ফ্রান্সিস ক্রিক, নেচার (১৯৭০)*

ক্রিক তথ্য প্রবাহের সমস্ত সম্ভাব্য দিককে তিনটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেছিলেন:

- **সাধারণ ও সার্বজনীন স্থানান্তর:**
  - $text{DNA} rightarrow text{DNA}$ (ডিএনএ পলিমারেজের মাধ্যমে রেপ্লিকেশন)
  - $text{DNA} rightarrow text{RNA}$ (আরএনএ পলিমারেজের মাধ্যমে ট্রান্সক্রিপশন)
  - $text{RNA} rightarrow text{}$প্রোটিন (রাইবোসোমের মাধ্যমে ট্রান্সলেশন)
- **বিশেষ স্থানান্তর (নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অনুমোদিত):**
  - $text{RNA} rightarrow text{RNA}$ (আরএনএ ভাইরাসের অনুলিপিকরণ)
  - $text{RNA} rightarrow text{DNA}$ (রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ এনজাইম দ্বারা রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন, যা ১৯৭০ সালে টেমিন ও বাল্টিমোর আবিষ্কার করেন)
  - $text{DNA} rightarrow text{}$প্রোটিন (কোষমুক্ত গবেষণাগার ব্যবস্থায় বিরল পরিস্থিতিতে)
- **নিষিদ্ধ স্থানান্তর (প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ অসম্ভব):**
  - $text{}$প্রোটিন$rightarrow text{}$প্রোটিন
  - $text{}$প্রোটিন$rightarrow text{RNA}$
  - $text{}$প্রোটিন$rightarrow text{DNA}$

Shakil Mahmud • Research Monograph

কোষের ভেতর এমন কোনো জৈব-রাসায়নিক কলকব্জা নেই যা একটি প্রোটিনের অ্যামিনো অ্যাসিড পড়ে তার পরিপূরক ডিএনএ তৈরি করতে পারে। এই একমুখী প্রবাহ ল্যামার্কীয় মতবাদকে (অর্জিত বৈশিষ্ট্য বংশানুক্রমে স্থানান্তরিত হওয়া) জীববিজ্ঞানের ইতিহাস থেকে চিরতরে মুছে দিল।

## অ্যাডাপ্টার অনুকল্প: টিআরএনএ-এর ভবিষ্যদ্বাণী

ক্রিকের সবচেয়ে বিস্ময়কর তাত্ত্বিক দূরদর্শিতা ছিল ট্রান্সলেশনের কার্যপদ্ধতি অনুধাবনে। বিখ্যাত পদার্থবিদ জর্জ গ্যামো প্রস্তাব করেছিলেন যে অ্যামিনো অ্যাসিডগুলো সরাসরি ডিএনএ-র খাঁজের ভেতর চাবির মতো বসে যায়। ক্রিক তাৎক্ষণিকভাবে বুঝলেন এটি রাসায়নিকভাবে অযৌক্তিক: লিউসিন বা ভ্যালিনের মতো বহু অ্যামিনো অ্যাসিড হলো তেলতেলে হাইড্রোফোবিক, যাদের সাথে ডিএনএ-র চার্জযুক্ত ক্ষারের কোনো বন্ধন তৈরি হওয়া সম্ভব নয়।

১৯৫৫ সালে ক্রিক তাঁর বিখ্যাত **অ্যাডাপ্টার হাইপোথিসিস** (Adaptor Hypothesis) প্রস্তাব করেন: প্রকৃতি নিশ্চয়ই এমন কোনো ছোট নিউক্লিক অ্যাসিড “অ্যাডাপ্টার” অণু তৈরি করেছে, যার এক মাথায় বাঁধা থাকবে একটি নির্দিষ্ট অ্যামিনো অ্যাসিড, আর অপর মাথায় থাকবে তিনটি নির্দিষ্ট ক্ষার—যা মেসেঞ্জার আরএনএ-র ক্ষারের সাথে হাইড্রোজেন বন্ধন তৈরি করতে পারবে।

তখন পর্যন্ত এমন কোনো অণুর প্রত্যক্ষ প্রমাণ কারও জানা ছিল না। কিন্তু মাত্র তিন বছরের মাথায় হার্ভার্ডের মাহলন হোগল্যান্ড ও পল জামেকনিক কোষের সাইটোপ্লাজম থেকে ঠিক সেই ছোট আরএনএ অণু আবিষ্কার করলেন—যার নাম দেওয়া হলো **ট্রান্সফার আরএনএ বা টিআরএনএ (tRNA)**। কেবল চিন্তার বিশুদ্ধ যুক্তি দিয়ে ক্রিক জীবকোষের অন্যতম প্রধান অনুঘটককে আবিষ্কারের আগেই চিহ্নিত করেছিলেন।

*সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "সেন্ট্রাল ডগমা — ফ্রান্সিস ক্রিক, অ্যাডাপ্টার অণু ও তথ্যের একমুখী প্রবাহ"। জিনতত্ত্বের ইতিহাস, খণ্ড ৬।*
*https://shakilmahmud.com/bn/story-of-genetics-part-06-central-dogma-crick-adaptor-molecules-directionality-bn/*

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • সপ্তম খণ্ড

# ত্রয়ী সংকেতের পাঠোদ্ধার — মার্শাল নিরেনবার্গ, হর গোবিন্দ খোরানা ও পলি-ইউ পরীক্ষা

*ত্রয়ী সংকেতের পাঠোদ্ধার — মার্শাল নিরেনবার্গ, হর গোবিন্দ খোরানা ও পলি-ইউ পরীক্ষা*

623 শব্দ • November 2, 2026 • ওয়েব সংস্করণ

❖



**চিত্র ৭:** *মার্শাল নিরেনবার্গ ও হর গোবিন্দ খোরানা: জেনেটিক কোড ও ট্রিপ্লেট কোডনের অর্থ উন্মোচনকারী নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী।*

১৯৬০ সালের মধ্যে জীববিজ্ঞানের তাত্ত্বিক ভিত প্রস্তুত ছিল: ফ্রান্সিস ক্রিকের সেন্ট্রাল ডগমা জানিয়ে দিয়েছিল নিউক্লিয়াসের ডিএনএ থেকে নির্দেশ নিয়ে মেসেঞ্জার আরএনএ সাইটোপ্লাজমে আসে, আর রাইবোসোমে বসে টিআরএনএ সেই নির্দেশ অনুযায়ী প্রোটিন তৈরি করে। কিন্তু সেই রহস্যময় সংকেতের ভাষাটি আসলে কেমন? ডিএনএ-র মাত্র চারটি রাসায়নিক ক্ষার $(A, U, G, C)$ দিয়ে বিশটি ভিন্ন ভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিডের নাম লিখতে হবে। যদি একটি ক্ষার একটি অ্যামিনো অ্যাসিডের সংকেত হতো, তবে মাত্র $4^1 = 4$টি অ্যামিনো অ্যাসিড প্রকাশ পেত। যদি দুটি ক্ষার মিলে একটি শব্দ হতো, তবে $4^2 = ১৬$টি শব্দ পাওয়া যেত—যা বিশের চেয়ে কম। অতএব, গণিতের নিয়মে সর্বনিম্ন শব্দ হতে হবে তিন অক্ষরের: অর্থাৎ একটি **ট্রিপ্লেট কোডন**, যার মোট বিন্যাস সংখ্যা $4^3 = ৬৪$টি। কিন্তু এই চৌষট্টিটি শব্দের কোনটি কোন অ্যামিনো অ্যাসিডকে নির্দেশ করে? জীবনের সেই রোসেটা স্টোন তখনো অনাবিষ্কৃত ছিল।

Shakil Mahmud • Research Monograph

## এনআইএইচ গবেষণাগারে পলি-ইউ পরীক্ষা

এই ঐতিহাসিক সাফল্য কোনো হার্ভার্ড বা কেমব্রিজের বিশ্বখ্যাত ল্যাব থেকে আসেনি; বরং তা এসেছিল মেরিল্যান্ডের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটস অব হেলথ (NIH)-এর এক নিভৃতচারী ৩৪ বছর বয়সী গবেষক **মার্শাল নিরেনবার্গ** (১৯২৭–২০১০) এবং তাঁর তরুণ জার্মান সহযোগী **হাইনরিখ ম্যাথাই** (জন্ম ১৯২৯)-এর হাত ধরে।

নিরেনবার্গ ও ম্যাথাই ই. *কোলাই* ব্যাকটেরিয়ার কোষ ভেঙে একটি কোষমুক্ত (Cell-free) ব্যবস্থা তৈরি করলেন, যার ভেতর সক্রিয় রাইবোসোম, টিআরএনএ এবং এনজাইম উপস্থিত ছিল কিন্তু ডিএনএ ধ্বংস করে দেওয়ায় তার নিজস্ব কোনো আরএনএ ছিল না। তাঁরা বিশটি টেস্টটিউব নিলেন। প্রতিটি টিউবে ১৯টি সাধারণ অ্যামিনো অ্যাসিড দেওয়া হলো, আর মাত্র একটি নির্দিষ্ট অ্যামিনো অ্যাসিডকে তেজস্ক্রিয় কার্বন-১৪ ($^{14}textC$) দ্বারা চিহ্নিত করা হলো।

১৯৬১ সালের ২৭ মে ভোররাত ৩টায় ম্যাথাই বিশটি টেস্টটিউবেই কৃত্রিমভাবে তৈরি **পলিইউরিডিলিক অ্যাসিড (পলি-ইউ)** যোগ করলেন—যা কেবল পুনরাবৃত্ত ইউরাসিল ক্ষার (text{…UUUUUUUUU…}) দিয়ে গঠিত। বিশটি টেস্টটিউবের মধ্যে উনিশটিতে কোনো বিক্রিয়া হলো না। কিন্তু পনেরো নম্বর টেস্টটিউব—যার মধ্যে ছিল তেজস্ক্রিয় $^{14}textC$**-ফেনাইলঅ্যালানিন**—সেখানে হঠাৎ তেজস্ক্রিয়তার এক অভূতপূর্ব বিস্ফোরণ ঘটল এবং টেস্টটিউবের তলায় জমা হলো অদ্রবণীয় প্রোটিনের স্তূপ!

পলি-ইউ আরএনএ কোষের মেশিনারিকে নির্দেশ দিয়ে তৈরি করেছে সম্পূর্ণ ফেনাইলঅ্যালানিনের শিকল (Polyphenylalanine)। মানব ইতিহাসে প্রথমবারের মতো জীবনের অভিধানের প্রথম শব্দের অর্থ উদ্ধার হলো:

$$textUUULongrightarrowtextফেনাইলঅ্যালানিন(Phe)$$

## মস্কো সম্মেলন ও সংকেতের পূর্ণাঙ্গ পাঠোদ্ধার

১৯৬১ সালের আগস্টে নিরেনবার্গ মস্কোয় পঞ্চম আন্তর্জাতিক বায়োকেমিস্ট্রি কংগ্রেসে যোগ দিতে যান। অখ্যাত বিজ্ঞানী হওয়ায় তাঁকে একটি ছোট ঘরে বক্তৃতার সময় দেওয়া হয়েছিল যেখানে মাত্র ত্রিশজন শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু ফ্রান্সিস ক্রিক এই গবেষণার কথা শুনে এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব তাৎক্ষণিকভাবে অনুধাবন করলেন। ক্রিক ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরের দিন সকালে কংগ্রেসের প্রধান মিলনায়তনে এক হাজার বিশ্বসেরা বিজ্ঞানীর সামনে নিরেনবার্গকে পুনরায় তাঁর বক্তৃতা দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। সেই বক্তৃতা শেষ হতেই সভাকক্ষ করতালিতে ফেটে পড়ল।

শুরু হলো বাকি কোডনগুলোর পাঠোদ্ধারের মহাযজ্ঞ। এই প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে বড় অবদান রাখলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত জৈব রসায়নবিদ **হর গোবিন্দ খোরানা** (১৯২২–২০১১)। উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ে খোরানা কৃত্রিমভাবে নিখুঁত রাসায়নিক ও এনজাইমেটিক পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট অনুক্রমের আরএনএ তৈরি করলেন (যেমন text{…UGUGUG…})। এই সুনির্দিষ্ট টেমপ্লেট ব্যবহার করে খোরানা দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ করলেন যে $textUGU$ সংকেত সিস্টিনকে এবং $textGUG$ সংকেত ভ্যালিনকে নির্দেশ করে।

## সার্বজনীন জেনেটিক অভিধানের রূপরেখা

১৯৬৬ সালের মধ্যে পৃথিবীর সমস্ত জীবের সার্বজনীন ৬৪টি কোডনের অর্থ সম্পূর্ণ উন্মোচিত হলো:

- **৬১টি অর্থপূর্ণ কোডন (Sense Codons):** যা ২০টি অ্যামিনো অ্যাসিডকে নির্দেশ করে।
- **সূচনাকারী কোডন ($textAUG$):** যা মিথিওনিন নির্দেশ করে এবং প্রোটিন তৈরির কাজ শুরু করার বিশ্বজনীন সংকেত হিসেবে কাজ করে।

- **৩টি সমাপ্তি কোডন ($textUAA, textUAG, textUGA$):** ওকার, অ্যাম্বার ও ওপাল—যা প্রোটিন তৈরির শিকল সমাপ্ত করার সংকেত প্রদান করে।
- **ডিজেনারেসি বা বাহুল্য:** যেহেতু কোডন ৬৪টি কিন্তু অ্যামিনো অ্যাসিড মাত্র ২০টি, তাই একটি অ্যামিনো অ্যাসিডকে একাধিক কোডন নির্দেশ করে। ১৯৬৬ সালে ফ্রান্সিস ক্রিক তাঁর **উওবল হাইপোথিসিস** (Wobble Hypothesis)-এর মাধ্যমে দেখান যে কোডনের তৃতীয় ক্ষারের নমনীয়তার কারণে একটি টিআরএনএ একাধিক সমার্থক কোডনকে চিনতে পারে।

সবচেয়ে বিস্ময়কর সত্য হলো, এই জেনেটিক কোড পৃথিবীর সকল জীবের জন্য **সার্বজনীন**। ব্যাকটেরিয়া থেকে শুরু করে বটগাছ কিংবা মানুষের কোষে—প্রতিটি জীবের ডিএনএ ঠিক একই ভাষায় কথা বলে। মানুষের ইনসুলিনের আরএনএ একটি সাধারণ ব্যাকটেরিয়ার ভেতর ঢুকিয়ে দিলে ব্যাকটেরিয়া সেই কোড পড়ে হুবহু মানুষের ইনসুলিন তৈরি করে দেয়। চারশো কোটি বছর পূর্বে লুকা (LUCA) থেকে শুরু করে আজকের প্রতিটি জীবকোষ যে একই শিকড়ের সন্তান—জেনেটিক কোডের এই সার্বজনীনতাই হলো তার সবচেয়ে অলঙ্ঘনীয় বৈজ্ঞানিক প্রমাণ।

*সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "ত্রয়ী সংকেতের পাঠোদ্ধার — মার্শাল নিরেনবার্গ, হর গোবিন্দ খোরানা ও পলি-ইউ পরীক্ষা"। জিনতত্ত্বের ইতিহাস, খণ্ড ৭। https://shakilmahmud.com/bn/story-of-genetics-part-07-cracking-triplet-code-nirenberg-khorana-poly-u-bn/*

Shakil Mahmud • Research Monograph

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • অষ্টম খণ্ড

# অপারনের যুক্তি — ফ্রাঁসোয়া জ্যাকব, জ্যাক মনোদ ও অ্যালস্টেরিক জিন নিয়ন্ত্রণ

*অপারনের যুক্তি — ফ্রাঁসোয়া জ্যাকব, জ্যাক মনোদ ও অ্যালস্টেরিক জিন নিয়ন্ত্রণ*

650 শব্দ • November 2, 2026 • ওয়েব সংস্করণ



**চিত্র ৮:** *জ্যাক মনোদ ও ফ্রাঁসোয়া জ্যাকব: ল্যাক অপারনের মাধ্যমে জিন প্রকাশ ও জৈব রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণের রূপকার।*

১৯৬০ সালের প্রারম্ভে আণবিক জিনতত্ত্ব ডিএনএ-র দ্বিসূত্রক কাঠামো ও জেনেটিক কোডের সার্বজনীন ভাষার সমাধান করেছিল। কিন্তু জীবনের একটি মৌলিক প্রশ্ন তখনো সম্পূর্ণ অনুদঘাটিত ছিল: *জিন নিয়ন্ত্রণ (Gene Regulation)*। একটি জীবকোষ তার জিনোমে থাকা সমস্ত জিন থেকে একই সাথে প্রোটিন তৈরি করে না; এমনটি ঘটলে তীব্র বিপাকীয় অপচয়ে কোষের মৃত্যু অনিবার্য হতো। আরও গভীর সত্য হলো, একটি বহুকোষী জীবের চোখের রেটিনা কোষ, ত্বকের কেরাটিনোসাইট কোষ এবং অগ্ন্যাশয়ের বিটা কোষ—সবার ভেতর হুবহু একই সম্পূর্ণ ডিএনএ লাইব্রেরি বিদ্যমান; অথচ প্রতিটি কোষ সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন প্রোটিন তৈরি করে স্বকীয় রূপ ধারণ করে। কোষ কীভাবে সিদ্ধান্ত নেয় কখন কোন জিন চালু হবে আর কখন বন্ধ থাকবে? এই প্রশ্নের জবাব এসেছিল প্যারিসের পাস্তুর ইনস্টিটিউট থেকে, দুই মহান ফরাসি বিজ্ঞানী **ফ্রাঁসোয়া জ্যাকব** (১৯২০–২০১৩) এবং **জ্যাক মনোদ** (১৯১০–১৯৭৬)-এর যৌথ গবেষণার মাধ্যমে।

## ডায়অক্সি ঘটনা ও ল্যাকটোজের বিপাক

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসিদের দখলে থাকা প্যারিসে বসে জ্যাক মনোদ *ইশেরিকিয়া কোলাই* ব্যাকটেরিয়ার খাদ্য গ্রহণ ও বৃদ্ধির গতিবিদ্যা নিয়ে কাজ করছিলেন। যখন তিনি গ্লুকোজ ও ল্যাকটোজ নামক দুটি শর্করা একসাথে ব্যাকটেরিয়াকে খেতে দিলেন, তখন তিনি বৃদ্ধির গ্রাফে এক অদ্ভুত বিরতি প্রত্যক্ষ করলেন, যাকে বলা হয় **ডায়অক্সি** (Diauxie):

1. প্রথমে ব্যাকটেরিয়া অত্যন্ত দ্রুত সমস্ত গ্লুকোজ খেয়ে শেষ করে বৃদ্ধি পেল।
2. গ্লুকোজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে বৃদ্ধির গতি প্রায় এক ঘণ্টার জন্য সম্পূর্ণ থেমে গেল।
3. এরপর ব্যাকটেরিয়া পুনরায় নতুন গতিতে ল্যাকটোজ হজম করতে শুরু করল।

মনোদ উপলব্ধি করলেন, গ্লুকোজ ভাঙার এনজাইমগুলো কোষে সবসময় তৈরি থাকে; কিন্তু ল্যাকটোজ ভাঙার প্রধান এনজাইম **বিটা-গ্যালাক্টোসিডেস** (*beta*-galactosidase) কোষে আগে থেকে থাকে না। ল্যাকটোজ না থাকলে কোষে এই এনজাইমের সংখ্যা থাকে পাঁচটিরও কম। কিন্তু পরিবেশে ল্যাকটোজ যুক্ত করার সাথে সাথে মাত্র কয়েক মিনিটের মাথায় হাজার গুণ বেশি এনজাইম তৈরি হতে থাকে, যা কোষের মোট প্রোটিনের প্রায় ৬-৭% দখল করে নেয়। একটি সাধারণ শর্করা কীভাবে জিনের সুইচে চাপ দিল?

## পাজামো পরীক্ষা ও অপারন মডেল

১৯৫৮ সালে মনোদ, ফ্রাঁসোয়া জ্যাকব এবং আর্থার পার্ডি মিলে পরিচালনা করলেন তাঁদের বিখ্যাত **পাজামো পরীক্ষা** (PaJaMo Experiment)। ব্যাকটেরিয়ার মিলনের (Conjugation) মাধ্যমে তাঁরা একটি সুস্থ ব্যাকটেরিয়ার জিন এমন এক মিউট্যান্ট ব্যাকটেরিয়ায় প্রবেশ করালেন যা নিজে ল্যাকটোজ ভাঙার এনজাইম তৈরি করতে অক্ষম ছিল।

ফলাফল দেখে তাঁরা বুঝতে পারলেন, কোষীয় জিন চালু করার পেছনে কোনো ‘অ্যাক্টিভেটর’ নেই; বরং প্রকৃতি কাজ করে **নেতিবাচক দমন বা রিপ্রেশন** (Negative Repression)-এর মাধ্যমে:

- স্বাভাবিক অবস্থায় জিনটি সবসময় বন্ধ থাকে।
- একটি নিয়ন্ত্রক জিন (যাকে নাম দেওয়া হলো $lacI$) সবসময় একটি বিশেষ প্রোটিন তৈরি করে, যার নাম **ল্যাক রিপ্রেসর** (Lac Repressor)।
- এই রিপ্রেসর প্রোটিনটি গিয়ে ডিএনএ-র একটি নির্দিষ্ট দরজায় শক্ত করে চেপে বসে থাকে, যার নাম জ্যাকব ও মনোদ দিলেন **অপারেটর** ($O$)।
- অপারেটরে রিপ্রেসর বসে থাকলে আরএনএ পলিমারেজ এনজাইম সামনে এগোতে পারে না, ফলে কাঠামোগত তিনটি জিন—$lacZ$ (বিটা-গ্যালাক্টোসিডেস), $lacY$ (পারমিয়েজ ট্রান্সপোর্টার) এবং $lacA$ (ট্রান্সঅ্যাসিটাইলেজ)—ট্রান্সক্রিপশন হতে পারে না।

একসাথে নিয়ন্ত্রিত এই সম্পূর্ণ জিনগুচ্ছকে তাঁরা নাম দিলেন **অপারন** (Operon)।

> *“অপারন হলো সমন্বিত জিন প্রকাশের এক কার্যকরী একক—যেখানে একাধিক কাঠামোগত জিন একটি সাধারণ প্রমোটর ও অপারেটরের অধীনে একসাথে একটিমাত্র পলিসিস্ট্রনিক মেসেঞ্জার আরএনএ-তে অনুলিপিত হয়।”*
> *— ফ্রাঁসোয়া জ্যাকব ও জ্যাক মনোদ, জার্নাল অব মলিকিউলার বায়োলজি (১৯৬১)*

Shakil Mahmud • Research Monograph

## অ্যালস্টেরি: আণবিক কম্পিউটিং সুইচ

ল্যাকটোজ যোগ করলে কীভাবে সুইচ চালু হয়? ল্যাকটোজ কোষে প্রবেশ করার পর তার একটি ছোট অংশ **অ্যালোল্যাকটোজ**-এ রূপান্তরিত হয়। এই অ্যালোল্যাকটোজ হলো আসল *ইন্ডিউসার*। এটি ডিএনএ স্পর্শ করে না; বরং এটি সরাসরি গিয়ে ল্যাক রিপ্রেসর প্রোটিনের গায়ে একটি বিশেষ খাঁজে আটকে যায়।

মনোদ একে বললেন **অ্যালস্টেরিক পরিবর্তন** (Allosteric Transition)। অ্যালোল্যাকটোজ যুক্ত হওয়ার সাথে সাথে রিপ্রেসর প্রোটিনটির ত্রিমাত্রিক আকার সামান্য বদলে যায়, যার ফলে অপারেটর ডিএনএ-কে ধরে রাখার ক্ষমতা তার দশ হাজার গুণ কমে যায়! চাবি খুলে যাওয়ার মতো রিপ্রেসরটি ডিএনএ থেকে খসে পড়ে। সাথে সাথে আরএনএ পলিমারেজ মুক্তি পেয়ে সামনের দিকে ছুটে যায় এবং দীর্ঘ একটি **পলিসিস্ট্রনিক mRNA** তৈরি করে তিনটি এনজাইমই একসাথে বিপুল পরিমাণে সংশ্লেষণ করে ফেলে।

ল্যাকটোজ খাওয়া শেষ হয়ে গেলে অ্যালোল্যাকটোজও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়; রিপ্রেসর আবার আগের রূপ ফিরে পেয়ে চোখের পলকে অপারেটরে বসে পড়ে এবং জিন বন্ধ করে দেয়। জিনোম কোনো জড় পাথরের শিলালিপি নয়; এটি এক জীবন্ত, গতিশীল বায়োকেমিক্যাল সাইবারনেটিক সার্কিট যা লজিক গেটের মতো কাজ করে। মনোদ বিখ্যাত মন্তব্য করেছিলেন: *“যা ই. কোলাই-এর জন্য সত্য, তা হাতির জন্যও সত্য।”* উচ্চতর জীবে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরও জটিল হলেও, অ্যালস্টেরিক ট্রান্সক্রিপশনাল সুইচের মৌলিক যুক্তিটিই আজ সমগ্র জীবজগতের চালিকাশক্তি।

❦

*সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "অপারনের যুক্তি — ফ্রাঁসোয়া জ্যাকব, জ্যাক মনোদ ও অ্যালস্টেরিক জিন নিয়ন্ত্রণ"। জিনতত্ত্বের ইতিহাস, খণ্ড ৮।*
*https://shakilmahmud.com/bn/story-of-genetics-part-08-logic-operon-jacob-monod-allosteric-transcription-bn/*

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • নবম খণ্ড

# গতিশীল জিন — বারবারা ম্যাকক্লিন্টক, ট্রান্সপোজন ও ভুট্টার রঙিন মোজাইক

*গতিশীল জিন — বারবারা ম্যাকক্লিন্টক, ট্রান্সপোজন ও ভুট্টার রঙিন মোজাইক*

729 শব্দ • November 2, 2026 • ওয়েব সংস্করণ



**চিত্র ৯:** *বারবারা ম্যাকক্লিন্টক: ভুট্টার ক্রোমোজোমে ট্রান্সপোজন বা স্থান পরিবর্তনশীল 'জাম্পিং জিন' আবিষ্কারক নোবেলজয়ী জিনবিজ্ঞানী।*

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বংশগতিবিদদের কাছে একটি ধারণা নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রের মতোই পরম সত্য বলে গৃহীত ছিল: *জীবের জিনোম হলো এক অনড়, অপরিবর্তনীয় ও স্থায়ী শিলালিপি*। মনে করা হতো ক্রোমোজোম হলো একটি শক্ত ধাতব তার, আর জিনগুলো সেই তারের গায়ে চিরতরে গেঁথে থাকা পাথরের পুঁতি। মিউটেশন ঘটতে পারে, কিন্তু পুঁতিগুলোর ভৌগোলিক অবস্থান কখনোই বদলে যেতে পারে না। ক্রোমোজোম ছিল গ্রানাইট পাথরের মতো অটল। এই ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করার অর্থ ছিল তৎকালীন জীববিজ্ঞানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা। কিন্তু লং আইল্যান্ডের কোল্ড স্প্রিং হারবার ল্যাবরেটরির ভুট্টা ক্ষেতে বসে এক নিভৃতচারী বিজ্ঞানী **বারবারা ম্যাকক্লিন্টক** (১৯০২–১৯৯২) তাঁর মনোocular অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে চোখ রেখে দেখতে পেলেন এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য: জিন কোনো অচল পাথর নয়; তারা জীবন্ত, চঞ্চল এবং নিজেদের বন্ধন ছিন্ন করে ক্রোমোজোমের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে লাফিয়ে বেড়াতে সক্ষম!

Shakil Mahmud • Research Monograph

## ভুট্টার সাইটোজেনেটিক্স ও রঙিন মোজাইক

১৯৩০-এর দশকেই ম্যাকক্লিন্টক উদ্ভিদকোষবিদ্যায় কিংবদন্তি হয়ে উঠেছিলেন। ভুট্টা গাছের (*Zea mays*) ওপর গবেষণা করে তিনি এমন কিছু বিশেষ রঞ্জক কৌশল উদ্ভাবন করেন যা দিয়ে মায়োসিস বিভাজনের সময় ক্রোমোজোমের সূক্ষ্ম রূপ খালি চোখে দেখা যেত। ১৯৩১ সালে তিনি প্রথম দেখান যে মেন্ডেলের ক্রসিং ওভার কেবল তাত্ত্বিক বিষয় নয়, এর ফলে ক্রোমোজোমের বাস্তবিক টুকরো শারীরিকভাবে নিজেদের জায়গা বদল করে।

১৯৪০-এর দশকের মাঝামাঝি ম্যাকক্লিন্টকের দৃষ্টি আটকে গেল ভুট্টার দানার এক বিচিত্র রঙের ওপর। সাধারণ ভুট্টার দানা সম্পূর্ণ হলুদ, সাদা কিংবা গাঢ় বেগুনি রঙের হয়। কিন্তু কিছু অদ্ভুত ভুট্টার মোচায় দেখা গেল দানার গায়ে যেন রঙের এক বুনো আলপনা আঁকা—হলুদ জমিনের ওপর বেগুনি রঙের ছিটছিট ফোঁটা, রেখা ও ডোরাকাটা নকশা। এই রঙিন ফোঁটার আকার ছিল বিচিত্র—কোনোটি ক্ষুদ্র বিন্দুর মতো, আবার কোনোটি দানার অর্ধাংশ জুড়ে বিস্তৃত। প্রচলিত মেন্ডেলীয় বংশগতি দিয়ে হাজার হাজার কোষে ঘটে চলা এই অবিশ্বাস্য অস্থিরতাকে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব ছিল।

## Ac-Ds সিস্টেম: ভাঙন ও লাফিয়ে চলা জিন

মাইক্রোস্কোপের নিচে ক্রোমোজোমের ভাঙন পর্যবেক্ষণ করে এবং সতর্ক বংশগতির হিসাব মিলিয়ে ম্যাকক্লিন্টক ভুট্টা ক্রোমোজোম ৯-এর খাটো বাহুতে একটি নির্দিষ্ট স্থান চিহ্নিত করলেন, যেখানে ক্রোমোজোমটি বারবার ভেঙে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল। তিনি এই ভাঙন স্থানের নাম দিলেন **ডিসোসিয়েশন (*Ds*)**।

কিন্তু ম্যাকক্লিন্টক লক্ষ্য করলেন, *Ds* একা নিজে নিজে ভাঙতে পারে না। তার জন্য প্রয়োজন হয় আরেকটি স্বাধীন জিনের, যার নাম তিনি দিলেন **অ্যাক্টিভেটর (*Ac*)**। ক্রোমোজোমে *Ac* না থাকলে *Ds* সম্পূর্ণ শান্ত ও নিষ্ক্রিয় থাকে। কিন্তু প্রজননের মাধ্যমে একবার *Ac* প্রবেশ করলেই শুরু হয় আসল আণবিক নাটক:

- *Ds* কেবল ক্রোমোজোমকে ভেঙে ফেলে না; আরও অবিশ্বাস্যভাবে সে তার নিজের জায়গা ছেড়ে স্থানান্তরিত হতে শুরু করে—মূল জায়গা থেকে উধাও হয়ে গিয়ে সে সোজা গিয়ে বসে পড়ে রঙের জন্য দায়ী বেগুনি জিন *C*-এর পেটের ভেতর!
- যখন *Ds* গিয়ে *C* জিনের ভেতর ঢুকে পড়ে, তখন বেগুনি রঙের প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়, ফলে দানাটি হয়ে যায় বর্ণহীন বা হলুদ।
- কিন্তু কোষের বৃদ্ধির পরবর্তী ধাপে *Ac*-এর উপস্থিতিতে *Ds* হঠাৎ করে আবার *C* জিন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে অন্য কোথাও লাফিয়ে চলে যায়! সাথে সাথে *C* জিনটি মুক্তি পেয়ে আবার বেগুনি রঙ তৈরি করা শুরু করে, যার ফলে হলুদ জমিনের ওপর জন্ম নেয় গাঢ় বেগুনি রঙের ফোঁটা!

দানাটির বৃদ্ধির যত প্রাথমিক পর্যায়ে এই জিনটি লাফিয়ে বের হয়ে আসে, বেগুনি ফোঁটাটির আয়তন তত বড় হয়। ম্যাকক্লিন্টক আবিষ্কার করলেন জীবজগতের প্রথম **ট্রান্সপোজাবল এলিমেন্ট বা ট্রান্সপোজন**—যাকে সাধারণ ভাষায় নাম দেওয়া হলো “জাম্পিং জিন” (Jumping Genes)।

> *“আমি যখন প্রথম দেখলাম তারা স্থান পরিবর্তন করেছে, আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। তারা কেবল স্থান পরিবর্তনই করে না, যে স্থানে গিয়ে বসে সেখানকার পার্শ্ববর্তী জিনগুলোর নিয়ন্ত্রণও নিজেদের হাতে তুলে নেয়। তাই আমি এদের নাম দিয়েছিলাম নিয়ন্ত্রক উপাদান।”*
> *— বারবারা ম্যাকক্লিন্টক (১৯৮৩)*

## তিন দশকের নিঃসঙ্গ বনবাস ও চূড়ান্ত স্বীকৃতি

১৯৫১ সালে কোল্ড স্প্রিং হারবার সিম্পোজিয়ামে ম্যাকক্লিন্টক যখন তাঁর এই যুগান্তকারী আবিষ্কার উপস্থাপন করলেন, তখন উপস্থিত বিজ্ঞানীরা গভীর নীরবতা ও তাচ্ছিল্যের সাথে তা প্রত্যাখ্যান করলেন। বিজ্ঞানীরা ভুট্টাকে ভাবলেন এক অপ্রাসঙ্গিক ব্যতিক্রম এবং ব্যাকটিরিয়ার সরল আণবিক জগতের সাথে এই তত্ত্বকে মেলানো গেল না। ম্যাকক্লিন্টক কারও সাথে বিতর্কে গেলেন না। তিনি বলেছিলেন: *“আপনি যদি জানেন আপনি সত্যের পথে আছেন, যদি আপনার অন্তরে সেই প্রত্যয় থাকে, তবে পৃথিবীর কেউ আপনাকে টলাতে পারবে না।”* তিনি সাধারণ জার্নালে লেখা বন্ধ করে দিলেন এবং কেবল বার্ষিক গবেষণা প্রতিবেদনে নীরবে কাজ নথিভুক্ত করতে লাগলেন।

অবশেষে ১৯৬০ ও ৭০-এর দশকে যখন ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী ট্রান্সপোজন আবিষ্কৃত হলো, তখন আধুনিক বিজ্ঞান ম্যাকক্লিন্টকের মহত্ত্ব উপলব্ধি করতে শুরু করল। ১৯৮০-এর দশকে আণবিক ক্লোনিং প্রমাণ করল ম্যাকক্লিন্টকের $Ac$ উপাদানটি আসলে একটি বিশেষ এনজাইম—**ট্রান্সপোজেস**—তৈরি করে, যা ডিএনএ কেটে নতুন জায়গায় জোড়া লাগায়।

হিউম্যান জিনোম প্রজেক্ট শেষ হওয়ার পর বিজ্ঞানীরা স্তম্ভিত হয়ে দেখলেন যে মানব জিনোমের প্রায় **অর্ধেক ডিএনএ-ই গঠিত হয়েছে এই ট্রান্সপোজন এবং তাদের অবশিষ্টাংশ দিয়ে!** ট্রান্সপোজন কোনো ত্রুটি নয়; এটি বিবর্তনের মূল চালিকাশক্তি। ১৯৮৩ সালে একা একা কাজ করা ৮১ বছর বয়সী এই মহীয়সী বিজ্ঞানী চিকিৎসাবিজ্ঞানে একক নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন—বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক নিঃসঙ্গ সত্যসাধকের চরম বিজয়।

*সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "গতিশীল জিন — বারবারা ম্যাকক্লিন্টক, ট্রান্সপোজন ও ভুট্টার রঙিন মোজাইক"। জিনতত্ত্বের ইতিহাস, খণ্ড ৯।*
*https://shakilmahmud.com/bn/story-of-genetics-part-09-mobile-elements-mcclintock-transposons-maize-bn/*

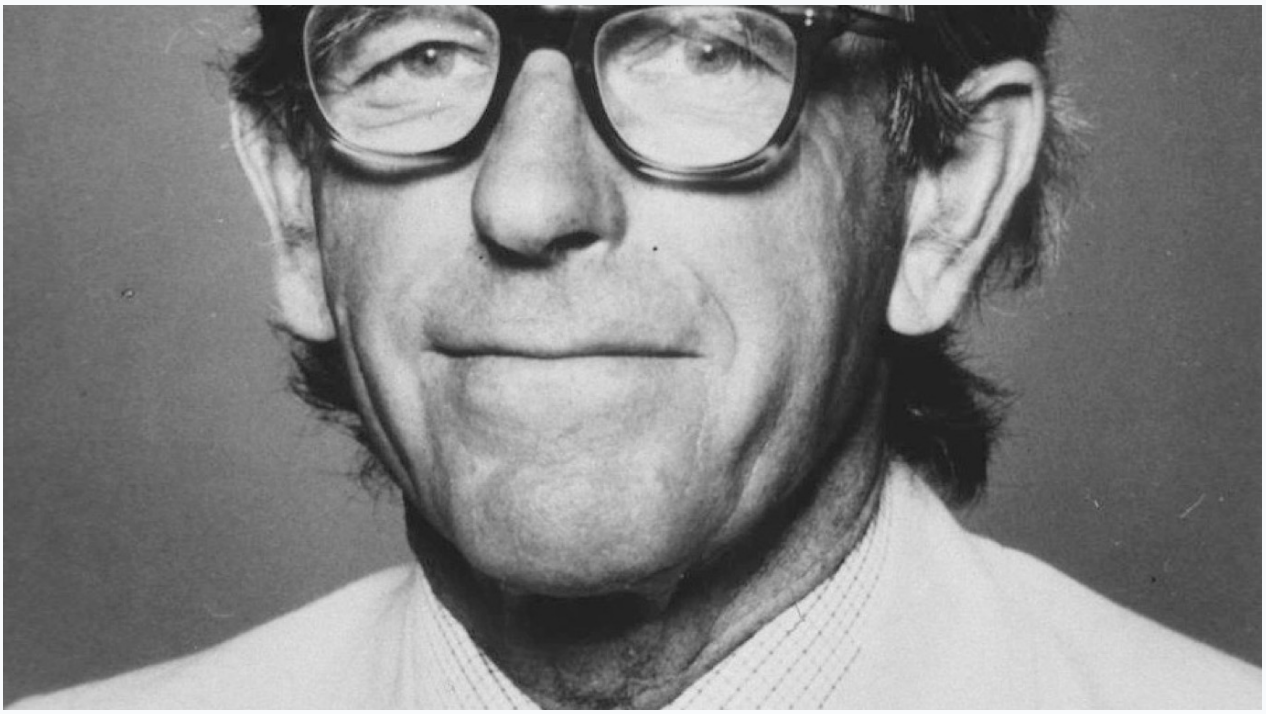
Shakil Mahmud • Research Monograph

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • দশম খণ্ড

# রাসায়নিক লিপির পাঠোদ্ধার — ফ্রেডেরিক স্যাঙ্গার, ডাইডেক্সিনিউক্লিওটাইড ও প্রথম জীবন্ত জিনোম

*রাসায়নিক লিপির পাঠোদ্ধার — ফ্রেডেরিক স্যাঙ্গার, ডাইডেক্সিনিউক্লিওটাইড ও প্রথম জীবন্ত জিনোম*

674 শব্দ • November 2, 2026 • ওয়েব সংস্করণ



**চিত্র ১০:** *ফ্রেডেরিক স্যাঙ্গার: ডাইডেক্সিনিউক্লিওটাইড চেইন-টার্মিনেশনের মাধ্যমে ডিএনএ সিকোয়েন্সিং উদ্ভাবনকারী দুইবারের নোবেলজয়ী রসায়নবিদ।*

১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে আণবিক জীববিজ্ঞানের কাছে ডিএনএ-র বর্ণমালার চারটি অক্ষর জানা ছিল, ট্রান্সক্রিপশনের নিয়ম স্পষ্ট ছিল এবং ৬৪টি কোডনের অর্থও উদ্ধার হয়েছিল। কিন্তু এই বিপুল জ্ঞান সত্ত্বেও বিজ্ঞানীরা ছিলেন কার্যত অন্ধ: প্রকৃতির একটি স্বাভাবিক দীর্ঘ ডিএনএ সুতোয় ক্ষারগুলো ঠিক কী ক্রমানুসারে সাজানো আছে, তা পড়ার কোনো প্রত্যক্ষ উপায় তাঁদের হাতে ছিল না। একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জিনের ক্ষারানুক্রম উদ্ধার করতে মাসের পর মাস ব্যয় হতো জটিল ও পরোক্ষ সব পদ্ধতিতে। ডিএনএ ছিল অতি দীর্ঘ, রাসায়নিকভাবে একঘেয়ে এবং সাধারণ বিশ্লেষণে সম্পূর্ণ অচিন্ত্যনীয়। জীবনের এই রাসায়নিক লিপি পাঠ করতে প্রয়োজন ছিল এমন এক কৌশল—যা স্বয়ং ডিএনএ রেপ্লিকেশনের প্রাকৃতিক এনজাইমকেই পাঠোদ্ধারের অস্ত্রে পরিণত করবে। সেই অসাধ্য সাধন করেছিলেন কেমব্রিজের এমআরসি ল্যাবরেটরি অব মলিকিউলার বায়োলজির মহান বিজ্ঞানী **ফ্রেডেরিক স্যাঙ্গার** (১৯১৮–২০১৩)।

## ডাইডেক্সি চেইন-টার্মিনেশন নীতি

স্যাঙ্গার বিজ্ঞানের জগতে তখন এক মহাতারকা: ১৯৫৮ সালে ইনসুলিনের ৫১টি অ্যামিনো অ্যাসিডের সঠিক ক্রম উদ্ধার করে তিনি রসায়নে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেছিলেন, যা প্রমাণ করেছিল প্রোটিনের একটি সুনির্দিষ্ট রৈখিক অনুক্রম থাকে। সেই অসামান্য মেধা নিয়ে যখন তিনি ডিএনএ-র দিকে তাকালেন, ১৯৭৭ সালে তাঁর মাথায় এক অপূর্ব বুদ্ধি খেলে গেল।

স্বাভাবিক অবস্থায় ডিএনএ পলিমারেজ যখন নতুন ডিএনএ তৈরি করে, তখন সে ব্যবহার করে **ডিঅক্সিনিউক্লিওটাইড ট্রাইফসফেট (dNTPs)**। বর্ধমান ডিএনএ সুতোর ৩ নম্বর কার্বনে থাকা হাইড্রক্সিল ($-OH$) মূলকের সাথে নতুন আগত নিউক্লিওটাইডের ফসফেট যুক্ত হয়ে ফসফোডায়েস্টার বন্ধন তৈরি হয় এবং শিকলটি সামনে এগিয়ে চলে।

স্যাঙ্গার গবেষণাগারে কৃত্রিমভাবে তৈরি করলেন এক বিশেষ রাসায়নিক অণু: **২’,৩’-ডাইডেক্সিনিউক্লিওটাইড (ddNTP)**। এই অণুটির ৩ নম্বর কার্বনে কোনো **হাইড্রক্সিল ($-OH$) মূলক নেই**, সেখানে রয়েছে কেবল একটি সাধারণ হাইড্রোজেন পরমাণু:

$$\text{সাধারণ dNTP: } ৩’\text{-OH উপস্থিত } \Longrightarrow \text{ডিএনএ শিকল বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে}$$

$$\text{বিশেষ ddNTP: } ৩’\text{-H উপস্থিত } \Longrightarrow \text{শিকলের বৃদ্ধি তাৎক্ষণিকভাবে চিরতরে বন্ধ!}$$

পলিমারেজ এনজাইম যখনই ভুলে একটি ডাইডেক্সি অণুকে ডিএনএ-র ভেতর ঢুকিয়ে দেয়, অমনি পরবর্তী নিউক্লিওটাইড যুক্ত করার হাতটি অবরুদ্ধ হয়ে যায়। শিকলের বৃদ্ধি সেখানেই চিরতরে সমাপ্ত (Chain Termination) হতে বাধ্য হয়।

## চার লেনের পলিঅ্যাক্রিলামাইড জেল

স্যাঙ্গার এক অনন্য সুন্দর পরীক্ষা সাজালেন। তিনি একটি টেস্ট ডিএনএ নিয়ে চারটি আলাদা টেস্টটিউবে ভাগ করলেন—$A$, $C$, $G$, এবং $T$:

- প্রতিটি টিউবেই প্রচুর পরিমাণে সাধারণ চারটি dNTP এবং ডিএনএ পলিমারেজ দেওয়া হলো (যার মধ্যে একটি ছিল তেজস্ক্রিয় ফসফরাস-৩২ যুক্ত)।
- $A$ টিউবে দেওয়া হলো সামান্য পরিমাণ **ddATP** (প্রতি ১০০টি সাধারণ dATP-র বিপরীতে মাত্র ১টি ডাইডেক্সি)।
- $C$ টিউবে দেওয়া হলো সামান্য **ddCTP**।
- $G$ টিউবে দেওয়া হলো সামান্য **ddGTP**।
- $T$ টিউবে দেওয়া হলো সামান্য **ddTTP**।

পলিমারেজ যখন নতুন সুতো তৈরি করছিল, শতকরা ৯৯ বার সে সাধারণ ক্ষার যুক্ত করে এগিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু দৈবাৎ ১ বার সে একটি ডাইডেক্সি ক্ষার জুড়ে দিচ্ছিল—যার ফলে সেই নির্দিষ্ট স্থানেই সুতোটির বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। ফলাফল হলো: $A$ টিউবের ভেতর কোটি কোটি এমন টুকরো তৈরি হলো যার প্রতিটির শেষ মাথায় রয়েছে একটি এডেনিন ($A$)। ঠিক একইভাবে বাকি তিনটি টিউবে তৈরি হলো $C$, $G$, এবং $T$-এ শেষ হওয়া সমস্ত সম্ভাব্য আকারের ডিএনএ টুকরো।

এরপর এই চার টিউবের দ্রবণকে একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন **পলিঅ্যাক্রিলামাইড জেল ইলেকট্রোফোরেসিস (PAGE)** প্লেটের পাশাপাশি চারটি লেনে দিয়ে বিদ্যুৎ চালনা করা হলো। ডিএনএ-র ফসফেটের ঋণাত্মক চার্জের কারণে টুকরোগুলো জেলের ভেতর দিয়ে ধনাত্মক মেরুর দিকে দৌড়াতে শুরু করল। ছোট টুকরোগুলো তীব্র গতিতে জেল ভেদ করে নিচে নেমে গেল, আর বড়

Shakil Mahmud • Research Monograph

টুকরোগুলো আটকে রইল উপরে।

সেই জেলের ওপর এক্স-রে ফিল্ম রাখতেই ভেসে উঠল এক অভূতপূর্ব কালো মইয়ের মতো সিঁড়ি। নিচ থেকে উপরের দিকে চোখ বুলিয়ে যে লেনে দাগ রয়েছে সেই অক্ষরটি লিখে নিলেই সরাসরি পড়ে ফেলা গেল কোটি কোটি বছর ধরে লুকিয়ে থাকা প্রকৃতির সেই পরম গোপন সংকেত!

## ফাই-এক্স-১৭৪: বিশ্বের প্রথম সম্পূর্ণ জিনোম

১৯৭৭ সালে স্যাঙ্গার এই কৌশলের সাহায্যে $PhitextX174$ নামক একটি ব্যাকটেরিওফায ভাইরাসের সম্পূর্ণ জিনোম সিকোয়েন্স সম্পন্ন করলেন। মানব ইতিহাসে প্রথমবারের মতো মানুষ কোনো জীবন্ত সত্তার সম্পূর্ণ রাসায়নিক নীলনকশা হাতে পেল: ঠিক **৫,৩৮৬টি ক্ষারের এক নিখুঁত মহাকাব্য**, যার মধ্যে লেখা ছিল ১১টি ভাইরাল প্রোটিনের সংকেত।

এই সিকোয়েন্স বিজ্ঞানীদের এক অবিশ্বাস্য চমক উপহার দিল: **ওভারল্যাপিং জিন**। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভাইরাসের সীমিত ডিএনএ-তে সর্বোচ্চ তথ্য ধারণের জন্য প্রকৃতি একই ডিএনএ টুকরোকে ভিন্ন ভিন্ন রিডিং ফ্রেমে পড়ে একাধিক সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রোটিন তৈরি করছিল! ১৯৮০ সালে ফ্রেডেরিক স্যাঙ্গার তাঁর জীবনের দ্বিতীয় নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন—বিজ্ঞানের ইতিহাসে যা মাত্র পাঁচজন মনীষীর ভাগ্যে জুটেছে।

পরবর্তী তিন দশক ধরে স্যাঙ্গারের এই সিকোয়েন্সিং পদ্ধতিই ছিল জীববিজ্ঞানের স্বর্ণমানদণ্ড। মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিএনএ থেকে শুরু করে প্রথম ব্যাকটেরিয়ার জিনোম এবং পরিশেষে ২০০৩ সালে সমাপ্ত ৩১০ কোটি ক্ষারের হিউম্যান জিনোম প্রজেক্ট—মানবজাতির সমস্ত জিনোমিক অর্জনের পেছনে প্রজ্বলিত ছিল স্যাঙ্গারের সেই অমর চেইন-টার্মিনেশন আলোকবর্তিকা।

*সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "রাসায়নিক লিপির পাঠোদ্ধার — ফ্রেডেরিক স্যাঙ্গার, ডাইডেক্সিনিউক্লিওটাইড ও প্রথম জীবন্ত জিনোম"। জিনতত্ত্বের ইতিহাস, খণ্ড ১০। https://shakilmahmud.com/bn/story-of-genetics-part-10-reading-chemical-sequence-sanger-dideoxy-genomes-bn/*

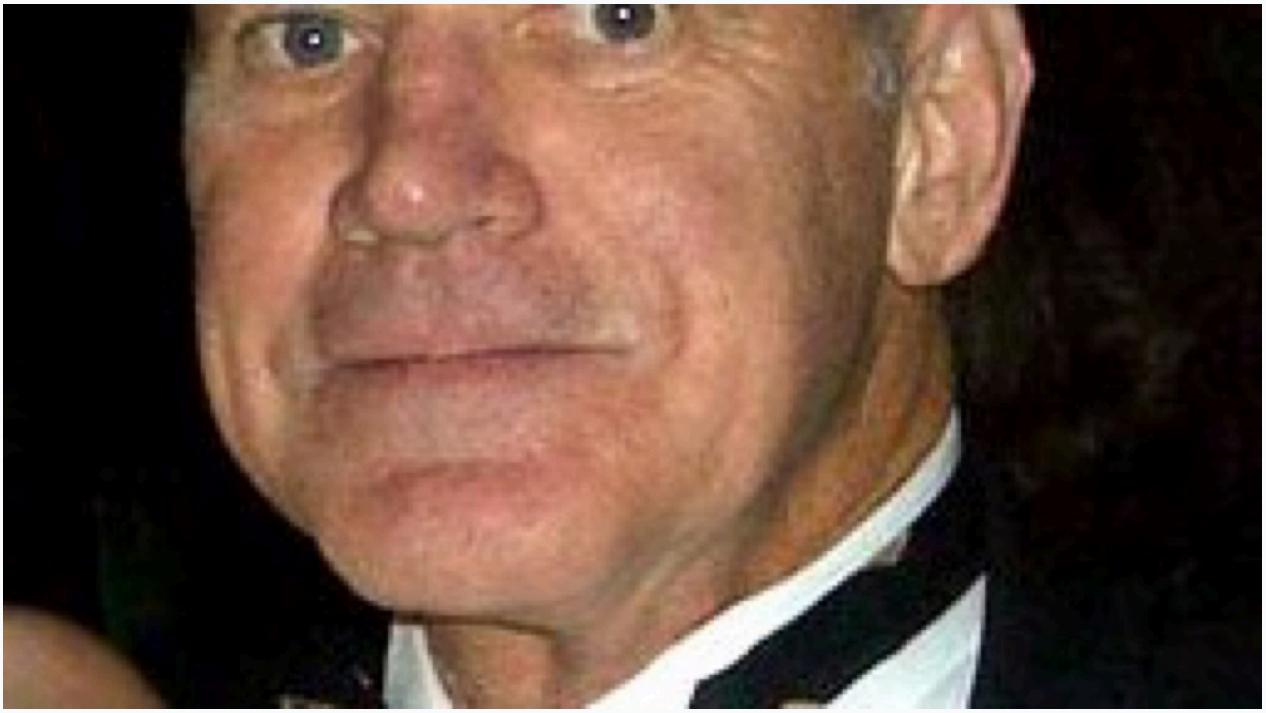
শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • একাদশ খণ্ড

# শূন্য থেকে বিস্তার — কেরি মুলিস, তাপীয় চক্র ও পিসিআর বিপ্লব

*শূন্য থেকে বিস্তার — কেরি মুলিস, তাপীয় চক্র ও পিসিআর বিপ্লব*

728 শব্দ • November 2, 2026 • ওয়েব সংস্করণ

❖



**চিত্র ১১:** *কেরি মুলিস: পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশন (পিসিআর) উদ্ভাবক, যার মাধ্যমে ডিএনএর কোটি কোটি কপি তৈরি সম্ভব হয়।*

আণবিক জীববিজ্ঞানের প্রথম তিন দশক জুড়ে জিনবিজ্ঞানীরা এক তীব্র ও নির্মম সীমাবদ্ধতায় বন্দি ছিলেন: *খড়ের গাদায় সুই খোঁজার সমস্যা*। মানুষের সম্পূর্ণ জিনোমে ছিল ৩১০ কোটি ক্ষারজোড়। আর একটি নির্দিষ্ট কার্যকরী জিন ছিল মাত্র কয়েক হাজার ক্ষারের সমষ্টি—যা মোট ডিএনএ-র দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ মাত্র। সেই একটিমাত্র জিনকে বিশ্লেষণ বা ক্লোনিং করতে প্রয়োজন হতো বোতল বোতল মানুষের রক্ত বা কেজি কেজি মাংসপেশি, এবং তারপর মাসের পর মাস ব্যাকটেরিয়ার ভেতর সেই ডিএনএ কালচার করার প্রাণান্তকর পরিশ্রম। যদি কোনো অপরাধের স্থানে পড়ে থাকত একটিমাত্র চুলের গোড়া, রক্তের একটি শুকনো কণা কিংবা এক ফোঁটা বীর্য—তবে জেনেটিক্স ছিল সম্পূর্ণ অসহায়; কারণ স্পেকট্রোফটোমিটারে ধরা পড়ার মতো পর্যাপ্ত ডিএনএ সেখানে উপস্থিত থাকত না। জীববিজ্ঞানের চরম প্রয়োজন ছিল এমন এক জাদুকরী জেরক্স মেশিনের—যা একটিমাত্র অণু খুঁজে নিয়ে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তার কোটি কোটি নিখুঁত কপি বানিয়ে দেবে। সেই অলৌকিক ধারণাটি এক রাতে জন্ম নিয়েছিল ক্যালিফোর্নিয়ার এক নির্জন পাহাড়ি হাইওয়েতে।

Shakil Mahmud • Research Monograph

## হাইওয়ে ১২৮-এর রাতের অলৌকিক দর্শন

১৯৮৩ সালের মে মাসের এক শুক্রবারের রাত। সিটাস কর্পোরেশনের বাতিকগ্রস্ত ৩৮ বছর বয়সী জৈব রসায়নবিদ **কেরি মুলিস** (১৯৪৪–২০১৯) তাঁর রূপালী রঙের হোন্ডা সিভিক গাড়ি চালিয়ে প্যাসিফিক কোস্টের পাহাড়ি আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে মেন্ডোসিনোর দিকে যাচ্ছিলেন। গাড়ির হেডলাইটের আলো যখন রেডউড অরণ্যের গাছের ওপর পড়ছিল, তখন মুলিসের মাথায় ঘুরছিল ডিএনএ সিকোয়েন্সিংয়ের একটি জটিল সমস্যা।

হঠাৎ তাঁর চিন্তার জগতে এক গাণিতিক বিস্ফোরণ ঘটল। তিনি ভাবলেন: যদি একটি নির্দিষ্ট জিনের দুই প্রান্তে *দুটি বিপরীতমুখী প্রাইমার* বসিয়ে দেওয়া যায়—একটি সেন্স সুতোয় আর অপরটি অ্যান্টিসেন্স সুতোয়, যাদের উভয়ের মুখ থাকবে পরস্পরের দিকে—এবং পলিমারেজ দিয়ে তাদের বৃদ্ধি করা হয়, তবে প্রথম চক্রে উৎপন্ন নতুন ডিএনএ টুকরোগুলো দ্বিতীয় চক্রে স্বয়ং নতুন টেমপ্লেট হিসেবে কাজ করতে শুরু করবে!

> *“ঈশ্বর! প্রতিটি চক্রে ডিএনএ দ্বিগুণ হতে থাকবে: দুই, চার, আট, ষোল, বত্রিশ, চৌষট্টি, একশ আঠাশ... মাত্র ত্রিশটি চক্রের পর সংখ্যাটি একশো কোটি ছাড়িয়ে যাবে! আমি গাড়ি থামিয়ে হাইওয়ের পাশে দাঁড়িয়ে একটি খামের পেছনে পাগলের মতো সমীকরণ লিখতে লাগলাম। হোন্ডা গাড়ির ধোঁয়া আর রেডউড বনের সুবাসের মাঝে দাঁড়িয়ে আমি বুঝতে পারলাম—আমি এমন কিছু আবিষ্কার করেছি যা এই পৃথিবীকে চিরতরে বদলে দেবে।”*
> *— কেরি মুলিস, ড্যান্সিং নেকেড ইন দ্য মাইন্ড ফিল্ড (১৯৯৮)*

মাত্র ৩০টি চক্রে উৎপন্ন হবে $২^{৩০} = ১,০৭,৩৭,৪১,৮২৪$টি কপি! অর্থাৎ অদৃশ্য জিপ্টোমোলের ($১০^{-২১} textmoles$) একটিমাত্র ডিএনএ অণু কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পরিণত হবে মাইক্রোগ্রাম পরিমাণের ঘন ডিএনএ-র পিণ্ডে, যা অতিবেগুনী রশ্মির নিচে জ্বলজ্বলে নিয়ন-কমলা রঙের ব্যান্ড হিসেবে খালি চোখেই দেখা যাবে।

## পিসিআর চক্রের তিনটি তাপীয় ধাপ

**পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশন (PCR)**-এর মূল সৌন্দর্য ছিল এর অ্যালগরিদমিক সরলতায়। প্রতিটি চক্র পরিচালিত হয় তিনটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রার পরিবর্তনের মাধ্যমে:

1. **ডিনেচুরেশন বা পৃথকীকরণ (৯৪^circ{C} – ৯৬^circ{C}):** প্রচণ্ড তাপে ডিএনএ-র হাইড্রোজেন বন্ধনগুলো ছিঁড়ে যায় এবং ডাবল হেলিক্সটি খুলে গিয়ে দুটি আলাদা একক সুতোয় পরিণত হয়।
2. **অ্যানিলিং বা প্রাইমার সংযোজন (৫০^circ{C} – ৬৫^circ{C}):** তাপমাত্রা দ্রুত কমিয়ে আনা হয়। লক্ষ লক্ষ সিন্থেটিক প্রাইমার ক্ষণিকের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত জিনের দুই প্রান্তের পরিপূরক ক্ষারের সাথে শক্তভাবে জোড়া লেগে যায়।
3. **এক্সটেনশন বা দীর্ঘকরণ (৭২^circ textC):** ডিএনএ পলিমারেজ প্রাইমারের মাথায় বসে দ্রুত ৫’ rightarrow ৩’ মুখে ক্ষারগুলো জুড়ে দিয়ে কাঙ্ক্ষিত জিনটির হুবহু অনুলিপি তৈরি করে ফেলে।

## ইয়েলোস্টোনের উষ্ণ প্রস্রবণ ও ট্যাক পলিমারেজ

মুলিসের প্রাথমিক পরীক্ষায় পিসিআর চালানো ছিল এক দুঃসহ শারীরিক নির্যাতন। তখন ব্যবহৃত হতো সাধারণ *ই. কোলাই* ব্যাকটেরিয়ার পলিমারেজ এনজাইম। কিন্তু সাধারণ এনজাইম ৫৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার উপরেই স্থায়ীভাবে নষ্ট হয়ে যায়; ফলে প্রতিটি চক্রের ৯৫ ডিগ্রির উত্তাপে এনজাইমটি ধ্বংস হয়ে যেত। গবেষককে ঘন্টার পর ঘণ্টা গরম পানির পাত্রের সামনে দাঁড়িয়ে প্রতি তিন মিনিট পর পর টেস্টটিউব হাত দিয়ে স্থানান্তর করতে হতো এবং প্রতি চক্রে নতুন করে মূল্যবান এনজাইম ঢালতে হতো।

চূড়ান্ত বৈপ্লবিক পরিবর্তনটি এলো ১৯৮৬ সালে। সিটাস কর্পোরেশনের বিজ্ঞানীরা আমেরিকার ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্কের ফুটন্ত গরম পানির প্রস্রবণ থেকে আবিষ্কৃত এক চরমভাবাপন্ন ব্যাকটেরিয়া—**থারমাস অ্যাকুয়াটিকাস**—থেকে একটি বিশেষ ডিএনএ পলিমারেজ আলাদা করলেন। ফুটন্ত পানিতে বেঁচে থাকতে অভ্যস্ত এই **ট্যাক পলিমারেজ** (Taq Polymerase) ৯৫ ডিগ্রির উত্তাপে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সম্পূর্ণ অক্ষত থাকত এবং ৭২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে প্রতি মিনিটে এক হাজার ক্ষার জোড়া লাগাতে পারত।

ট্যাক পলিমারেজ আসার সাথে সাথে পিসিআর স্বয়ংক্রিয় হয়ে গেল ডেস্কটপ **থার্মাল সাইক্লার** মেশিনের ভেতর। একটি ছোট প্লাস্টিকের নলে সামান্য ডিএনএ, প্রাইমার, ক্ষার ও ট্যাক পলিমারেজ দিয়ে মেশিনের বোতাম চেপে বাড়ি চলে যাওয়া যেত; তিন ঘণ্টা পর ফিরে এসে দেখা যেত টেস্টটিউবে জমা হয়ে গেছে এক কোটি নিখুঁত জিন!

পিসিআরের প্রভাব মানব সভ্যতার প্রতিটি শাখায় বিদ্যুৎচমকের মতো ছড়িয়ে পড়ল। এটি অপরাধ তদন্তে ফরেনসিক ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্টিংয়ের জন্ম দিল (একটি মাত্র রক্তের দাগ বা আঙুলের ছাপ থেকে অপরাধী শনাক্তকরণ); গর্ভস্থ শিশুর জিনগত রোগ নির্ণয় সম্ভব করল; বিলুপ্ত ম্যামথ ও নিয়ান্ডারথালের কঙ্কাল থেকে ডিএনএ উদ্ধার করে প্রাচীন ইতিহাসকে জীবন্ত করল; এবং করোনা মহামারীর মতো বৈশ্বিক দুর্যোগে হয়ে উঠল রোগ নির্ণয়ের প্রধান হাতিয়ার (RT-qPCR)। ১৯৯৩ সালে কেরি মুলিস তাঁর এই অনন্য সাধারণ আবিষ্কারের জন্য রসায়নে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন।

*সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "শূন্য থেকে বিস্তার — কেরি মুলিস, তাপীয় চক্র ও পিসিআর বিপ্লব"। জিনতত্ত্বের ইতিহাস, খণ্ড ১১।*
*https://shakilmahmud.com/bn/story-of-genetics-part-11-amplifying-void-mullis-thermal-cycling-pcr-revolution-bn/*

Shakil Mahmud • Research Monograph

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • দ্বাদশ খণ্ড

# রিকম্বিন্যান্ট প্রকৌশলী — পল বার্গ, হার্বার্ট বয়ার, স্ট্যানলি কোহেন ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সূচনা

*রিকম্বিন্যান্ট প্রকৌশলী — পল বার্গ, হার্বার্ট বয়ার, স্ট্যানলি কোহেন ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সূচনা*

699 শব্দ • November 2, 2026 • ওয়েব সংস্করণ

❖



**চিত্র ১২:** *হার্বার্ট বয়ার ও স্ট্যানলি কোহেন: রিকম্বিন্যান্ট ডিএনএ প্রযুক্তি ও আধুনিক জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রতিষ্ঠাতা।*

চারশো কোটি বছর ধরে পৃথিবীর জীবজগতে এক অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর বিদ্যমান ছিল: প্রতিটি প্রজাতি কেবল তার নিজস্ব প্রজাতির ভেতর জিন আদান-প্রদান করত। ব্যাকটেরিয়ার জিন যেত অন্য ব্যাকটেরিয়ায়, উদ্ভিদের পরাগ পরাগায়ন করত নিজ উদ্ভিদে, স্তন্যপায়ী প্রাণী বংশবৃদ্ধি করত তার স্বগোত্রে। ভিন্ন ট্যাক্সোনমিক রাজ্যের মধ্যবর্তী আণবিক প্রাচীর ছিল দুর্ভেদ্য। কিন্তু ১৯৭০-এর দশকের প্রারম্ভে বিজ্ঞানীরা জীবনের বইয়ের নিছক নিষ্ক্রিয় পাঠক থেকে সক্রিয় লেখকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। আণবিক কাঁচি, জৈব আঠা এবং ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জেনেটিক যানের ওপর প্রভুত্ব কায়েম করে মানুষ এমন এক অভাবনীয় ক্ষমতা অর্জন করল—যার মাধ্যমে এক প্রজাতির জিন কেটে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রজাতির ডিএনএ-র সাথে জোড়া লাগানো সম্ভব হয়ে উঠল। সূচনা হলো **রিকম্বিন্যান্ট ডিএনএ** প্রযুক্তি ও আধুনিক **জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং**-এর এক নতুন যুগ।

## আণবিক হাতিয়ার: রেস্ট্রিকশন এনজাইম, লাইগেজ ও প্লাজমিড

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল তিনটি অসাধারণ জৈব হাতিয়ারের ওপর:

1. **রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়েজ (আণবিক কাঁচি):** ১৯৭০ সালে হ্যামিল্টন স্মিথ ও ওয়ার্নার আরবার আবিষ্কার করেন যে ব্যাকটেরিয়ার শরীরে এমন কিছু প্রতিরক্ষাকারী এনজাইম থাকে যা আক্রমণকারী ভাইরাসের ডিএনএ-কে সুনির্দিষ্ট স্থানে কেটে টুকরো করে দেয়। সান ফ্রান্সিসকোতে বায়োকেমিস্ট **হার্বার্ট বয়ার** (জন্ম ১৯৩৬) ই. *কোলাই* থেকে আলাদা করলেন এক জাদুকরী কাঁচি: **EcoRI**। এই এনজাইমটি ডিএনএ-কে সোজাসুজি ভোঁতাভাবে কাটত না; বরং সে ছয়টি নির্দিষ্ট ক্ষারের অনুক্রম (5’text{-GAATTC-}3’) চিনে নিয়ে দুই সুতোকে সামান্য তেরছাভাবে কেটে দিত, যার ফলে দুই প্রান্তে তৈরি হতো চার অক্ষরের একক ঝুলন্ত সুতো (5’text{-AATT-}3’)। বয়ার এদের নাম দিলেন **স্টিকি এন্ড** (Sticky Ends বা আঠালো প্রান্ত)। মহাবিশ্বের যে কোনো জীবের ডিএনএ-কে যদি EcoRI দিয়ে কাটা যায়, তবে তার প্রান্তগুলো একে অপরের সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে জোড়া লেগে যাবে!
2. **ডিএনএ লাইগেজ (আণবিক আঠা):** ১৯৬৭ সালে আবিষ্কৃত এই এনজাইমটি ডিএনএ-র ফসফোডায়েস্টার বন্ধন পুনরায় তৈরি করে আলাদা থাকা দুটি ডিএনএ টুকরোকে এক অবিচ্ছেদ্য অণুতে জোড়া লাগিয়ে দিতে পারে।
3. **ব্যাকটেরিয়াল প্লাজমিড (আণবিক যান):** স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনেটিসিস্ট **স্ট্যানলি কোহেন** (জন্ম ১৯৩৫) ব্যাকটেরিয়ার প্রধান ক্রোমোজোমের বাইরে থাকা ক্ষুদ্র বৃত্তাকার ডিএনএ নিয়ে গবেষণা করছিলেন, যার নাম প্লাজমিড। কোহেন **pSC101** নামক এমন এক প্লাজমিড তৈরি করেছিলেন যা টেট্রাসাইক্লিন অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধ করতে পারত এবং কোষে নিজে নিজেই দ্বিগুণ হতে সক্ষম ছিল। শুধু তাই নয়, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ও তাপ দিয়ে ব্যাকটেরিয়ার কোষপ্রাচীরকে সাময়িকভাবে শিথিল করে বাইরে থেকে প্লাজমিড ঢুকিয়ে দেওয়ার পদ্ধতিও তিনি আবিষ্কার করেছিলেন।

## হনোলুলুর স্যান্ডউইচ ও মধ্যরাতের বিপ্লব (১৯৭২)

১৯৭২ সালের নভেম্বরে হাওয়াই দ্বীপের হনোলুলুতে এক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে বয়ার ও কোহেনের দেখা হয়। এক গভীর রাতে একটি সাধারণ ডেলির দোকানে বসে প্যাস্ট্রামি ও স্যান্ডউইচ খেতে খেতে তাঁরা উপলব্ধি করলেন যে তাঁদের দুজনের হাতে থাকা আবিষ্কারগুলো আসলে একটি আরেকটির পরিপূরক:

- বয়ারের কাছে আছে আণবিক কাঁচি (EcoRI), যা দিয়ে যেকোনো ডিএনএ কেটে আঠালো প্রান্ত তৈরি করা যায়।
- কোহেনের কাছে আছে সেই ডিএনএ বহন করার প্লাজমিড যান এবং তা ব্যাকটেরিয়ার ভেতরে প্রবেশ করানোর কৌশল।

ক্যালিফোর্নিয়ায় ফিরে ১৯৭৩ সালের বসন্তে তাঁরা পৃথিবীর প্রথম কৃত্রিম রিকম্বিন্যান্ট জীব সৃষ্টি করলেন। তাঁরা pSC101 প্লাজমিডকে EcoRI দিয়ে কেটে তার ভেতর ভিন্ন ব্যাকটেরিয়ার অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী জিন লাইগেজ দিয়ে জুড়ে দিলেন এবং তা সাধারণ ই. *কোলাই*-এর ভেতর ঢুকিয়ে দিলেন। বিষাক্ত অ্যান্টিবায়োটিকযুক্ত পেট্রিডিশে সেই নতুন সংকর ব্যাকটেরিয়া বীরদর্পে বেঁচে রইল! এর কিছুদিন পরেই তাঁরা আফ্রিকান ব্যাঙের (*Xenopus laevis*) জিন কেটে ব্যাকটেরিয়ার ভেতর সফলভাবে প্রকাশ করে দেখালেন। চারশো কোটি বছরের বিবর্তনীয় প্রজাতির প্রাচীর এক রাতের মধ্যে ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

## অ্যাসিলোমার সম্মেলন ও বায়োটেকনোলজির জন্ম

মানবজাতির হাতে এমন এক ক্ষমতা এসেছে যা দিয়ে কৃত্রিম দানব ভাইরাস বা নতুন জীবাণু তৈরি করা সম্ভব—এই অনুভূতি বিজ্ঞানীদের মনে গভীর শঙ্কা জাগিয়ে তুলল। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী **পল বার্গ** (১৯২৬–২০২৩), যিনি ১৯৭২ সালে প্রথম বানরের টিউমার সৃষ্টিকারী SV40 ভাইরাসকে ব্যাকটেরিওফাযের সাথে জুড়েছিলেন, তিনি স্বেচ্ছায় নিজের কাজ বন্ধ করে দিলেন এই ভয়ে যে ক্যান্সার সৃষ্টিকারী ভাইরাস হয়তো ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে মানুষের অন্ত্রে মহামারী ডেকে আনবে।

১৯৭৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে ক্যালিফোর্নিয়ার অ্যাসিলোমারে বিশ্বের ১৪০ জন শীর্ষ বিজ্ঞানী ও আইনজীবীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হলো ঐতিহাসিক **অ্যাসিলোমার সম্মেলন**। সেখানে চার দিনের তীব্র বিতর্কের পর বিজ্ঞানীরা স্বেচ্ছায় গবেষণার ওপর কঠোর আন্তর্জাতিক জৈব-নিরাপত্তা নীতিমালা (BSL-1 থেকে BSL-4) প্রণয়ন করলেন এবং ঘোষণা করলেন এমন সব বিকলাঙ্গ ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করতে হবে যা পেট্রিডিশের বাইরে উন্মুক্ত প্রকৃতিতে এক মুহূর্তও বাঁচতে পারে না।

Shakil Mahmud • Research Monograph

নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়ার পর জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং পরিণত হলো বৈশ্বিক শিল্পবিপ্লবে। ১৯৭৬ সালে হার্বার্ট বয়ার ও তরুণ বিনিয়োগকারী রবার্ট সোয়ানসন প্রতিষ্ঠা করলেন পৃথিবীর প্রথম বায়োটেক কোম্পানি **জেনেটেক** (Genentech)। ১৯৭৮ সালে জেনেটেকের বিজ্ঞানীরা ব্যাকটেরিয়ার পেটের ভেতর মানুষের ইনসুলিন জিন ঢুকিয়ে সফলভাবে তৈরি করলেন **রিকম্বিন্যান্ট মানব ইনসুলিন** (Humulin)। গরু বা শূকরের অগ্ন্যাশয় কেটে তৈরি করা নিম্নমানের ইনসুলিনের ওপর ডায়াবেটিস রোগীদের আর নির্ভর করতে হলো না। ১৯৮০ সালে পল বার্গ রসায়নে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন। জীবন আর প্রকৃতির অন্ধ খেলার অধীন রইল না; তা রূপান্তরিত হলো প্রোগ্রামযোগ্য এক মহাবিশ্বে।

*সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "রিকম্বিন্যান্ট প্রকৌশলী — পল বার্গ, হার্বার্ট বয়ার, স্ট্যানলি কোহেন ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সূচনা"। জিনতত্ত্বের ইতিহাস, খণ্ড ১২। https://shakilmahmud.com/bn/story-of-genetics-part-12-recombinant-splicers-berg-boyer-cohen-genetic-engineering-bn/*

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • ত্রয়োদশ খণ্ড

# মানবজাতির মহাকাব্য — হিউম্যান জিনোম প্রজেক্ট, ক্রেইগ ভেন্টর, ফ্রান্সিস কলিন্স ও শটগান সিকোয়েন্সিং

*মানবজাতির মহাকাব্য — হিউম্যান জিনোম প্রজেক্ট, ক্রেইগ ভেন্টর, ফ্রান্সিস কলিন্স ও শটগান সিকোয়েন্সিং*

657 শব্দ • November 2, 2026 • ওয়েব সংস্করণ




**চিত্র ১৩:** *ফ্রান্সিস কলিন্স ও ক্রেইগ ভেন্টর: হিউম্যান জিনোম প্রজেক্টের মাধ্যমে মানব জিনোমের সম্পূর্ণ মানচিত্র উন্মোচনকারী দলনেতা।*

বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে মানবজাতি তার ইতিহাসের বৃহত্তম জীববৈজ্ঞানিক সহযোগিতার সূচনা করে: **হিউম্যান জিনোম প্রজেক্ট (HGP)**। ১৯৯০ সালের অক্টোবরে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হওয়া এই প্রজেক্টের লক্ষ্য ছিল মহাকাশে অ্যাপোলো অভিযানের মতোই উচ্চাভিলাষী: মানুষের তেইশ জোড়া ক্রোমোজোমে লুকানো সম্পূর্ণ রাসায়নিক সংকেতের পাঠোদ্ধার করা—যার মোট দৈর্ঘ্য **৩১০ কোটি ক্ষারজোড় (৩.১ বিলিয়ন বেস পেয়ার)**। এই সম্পূর্ণ ক্ষারানুক্রম যদি সাধারণ বই আকারে ছাপা হতো, তবে সেই বইয়ের স্তূপ আমেরিকার ওয়াশিংটন মনুমেন্টকেও ছাড়িয়ে যেত। জীববিজ্ঞানের ইতিহাসে এটি ছিল চাঁদে মানুষের পা রাখার মতোই এক কালজয়ী মুহূর্ত।

## দুটি বিপরীতমুখী দর্শন: ব্যাক-টু-ব্যাক ক্লোনিং বনাম শটগান সিকোয়েন্সিং

আমেরিকান সরকারের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটস অব হেলথ (NIH) এবং ব্রিটিশ ওয়েলকাম ট্রাস্টের অর্থায়নে পরিচালিত আন্তর্জাতিক কনসোর্টিয়ামের নেতৃত্বে ছিলেন জিনবিজ্ঞানী **ফ্রান্সিস কলিন্স** (জন্ম ১৯৫০)। সরকারি দলটি গ্রহণ করেছিল এক সতর্ক ও নিখুঁত পদ্ধতি:

Shakil Mahmud • Research Monograph

1. প্রথমে মানুষের দীর্ঘ ডিএনএ-কে ১,৫০,০০০ ক্ষারের বড় বড় টুকরোয় কেটে ব্যাকটেরিয়ার কৃত্রিম ক্রোমোজোমে (BAC) ক্লোন করা হতো।
2. ক্রোমোজোমে এই টুকরোগুলোর নির্দিষ্ট অবস্থান আগে ম্যাপ করা হতো।
3. এরপর প্রতিটি পরিচিত টুকরোকে আরও ছোট করে কেটে প্রচলিত স্যাঙ্গার পদ্ধতিতে জেল দিয়ে ধীরে ধীরে সিকোয়েন্স করা হতো।

কিন্তু আট বছর গবেষণার পরও ১৯৯৮ সাল নাগাদ জিনোমের মাত্র ১০% কাজ শেষ হয়েছিল। ঠিক সেই সময় দৃশ্যপটে আবির্ভূত হলেন এক ঝোড়ো চরিত্র: আমেরিকার ভিয়েতনাম যুদ্ধের সাবেক নৌবাহিনীর চিকিৎসাকর্মী ও প্রতিভাবান জৈব রসায়নবিদ **জে. ক্রেইগ ভেন্টর** (জন্ম ১৯৪৬)। তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন একটি বেসরকারি কোম্পানি **সেলেরারা জিনোমিক্স** (Celera Genomics)। পারকিন-এলমারের তৈরি আধুনিক **ক্যাপিলারি সিকোয়েন্সার** (যা তরল নলের ভেতর লেজার রশ্মি দিয়ে প্রতি মিনিটে শত শত ক্ষার পড়তে পারত) ব্যবহার করে ভেন্টর সরাসরি সরকারি প্রজেক্টকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন।

ভেন্টর প্রস্তাব করলেন এক সাহসী ও ঝুঁকিপূর্ণ কম্পিউটার-নির্ভর কৌশল: **হোল-জিনোম শটগান সিকোয়েন্সিং**। ভেন্টর বললেন, বছরের পর বছর ধরে ম্যাপ তৈরি করার কোনো দরকার নেই:

- মানুষের সম্পূর্ণ ৩১০ কোটি ক্ষারকে কোটি কোটি এলোমেলো ছোট ছোট টুকরোয় গুঁড়ো করে ফেলা হবে।
- ৩০০টি অত্যাধুনিক স্বয়ংক্রিয় রোবোটিক মেশিন দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা সেই টুকরোগুলোর দুই মাথা সিকোয়েন্স করবে।
- এরপর এক শক্তিশালী সুপারকম্পিউটার জটিল গ্রাফ অ্যালগরিদমের সাহায্যে টুকরোগুলোর ওভারল্যাপিং অংশ মিলিয়ে কোটি কোটি টুকরোকে এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশে পূর্ণাঙ্গ জিনোমে জোড়া লাগিয়ে দেবে!

সরকারি বিজ্ঞানীরা দাবি করলেন যে মানব ডিএনএ-তে থাকা পুনরাবৃত্তিমূলক সিকোয়েন্সের কারণে ভেন্টরের কম্পিউটার জট পাকিয়ে ফেলবে। কিন্তু ভেন্টরের রোবটগুলো অবিশ্বাস্য গতিতে কোটি কোটি ক্ষার পড়তে শুরু করল, যার ফলে সরকারি দলও তাদের কাজের গতি দশগুণ বাড়িয়ে দিতে বাধ্য হলো।

## হোয়াইট হাউসের ঐতিহাসিক ঘোষণা (২৬ জুন ২০০০)

মানুষের জিনোমের ওপর যাতে কোনো বাণিজ্যিক কোম্পানির একচেটিয়া পেটেন্ট কায়েম না হয়, সেজন্য আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের মধ্যস্থতায় দুই দলের মধ্যে ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। ২০০০ সালের ২৬ জুন হোয়াইট হাউসের ইস্ট রুমে দাঁড়িয়ে ফ্রান্সিস কলিন্স এবং ক্রেইগ ভেন্টর বিশ্ববাসীর সামনে যৌথভাবে মানব জিনোমের খসড়া মানচিত্র সমাপ্তির ঘোষণা দিলেন।

> *“আজ আমরা সেই ভাষা পাঠ করতে শিখছি—যে ভাষায় ঈশ্বর জীবন সৃষ্টি করেছিলেন। স্রষ্টার এই পরম পবিত্র উপহারের জটিলতা, সৌন্দর্য ও মহত্ত্ব দেখে আমাদের অন্তর গভীর বিস্ময়ে ভরে উঠছে।”*
> *— প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন, হোয়াইট হাউস ভাষণ (২৬ জুন ২০০০)*

২০০১ সালের ফেব্রুয়ারিতে *নেচার* ও *সায়েন্স* পত্রিকায় মানব জিনোমের প্রথম বিশ্লেষণ প্রকাশিত হয় এবং ২০০৩ সালের এপ্রিলে—ওয়াটসন ও ক্রিকের আবিষ্কারের ঠিক ৫০তম বার্ষিকীতে—মানব জিনোমের ৯৯.৯৯% নির্ভুল চূড়ান্ত রূপ উন্মোচিত হয়।

## মানব জিনোমের অবিশ্বাস্য সত্যসমূহ

জিনোমের সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার জীববিজ্ঞানীদের পূর্ববর্তী সমস্ত ধারণাকে ওলটপালট করে দিয়েছিল:

- **জিনের অভাবনীয় স্বল্পতা:** প্রজেক্ট শুরুর আগে বিজ্ঞানীরা ভেবেছিলেন মানুষের উন্নত মস্তিষ্ক ও জটিল শারীরিক গঠনের জন্য অন্তত ১ লক্ষ থেকে দেড় লক্ষ জিনের প্রয়োজন হবে। কিন্তু সিকোয়েন্স দেখে বিজ্ঞানীরা হতবাক হয়ে গেলেন: মানুষের দেহে রয়েছে মাত্র **২০,০০০ থেকে ২১,০০০ কার্যকরী জিন**—যা একটি সাধারণ মাইক্রোস্কোপিক কৃমির (১৯,০০০ জিন) প্রায় সমান এবং সাধারণ ধান গাছের (৩২,০০০ জিন) চেয়েও কম! মানুষের জটিলতা জিনের সংখ্যায় নয়, বরং আরএনএ স্প্লাইসিং ও জিনের সমন্বিত নিয়ন্ত্রণে নিহিত।
- **কোডিং অংশের ক্ষুদ্রতা:** আমাদের মোট ৩১০ কোটি ক্ষারের মধ্যে মাত্র **১.৫%** অংশ সরাসরি প্রোটিন তৈরির নির্দেশ বহন করে। বাকি ৯৮.৫% অংশই নন-কোডিং ডিএনএ—যার মধ্যে রয়েছে প্রাচীন ভাইরাসের অবশিষ্টাংশ, নিয়ন্ত্রক সুইচ ও ট্রান্সপোজন।
- **সকল মানুষের মৌলিক সমতা:** পৃথিবীর যে কোনো দুই প্রান্তের মানুষের জিনোম তুলনা করলে দেখা যায় তাদের **৯৯.৯% ডিএনএ হুবহু এক**। মানুষের বর্ণ, মুখের গড়ন বা দৈহিক বৈচিত্র্যের সমস্ত পার্থক্য নিহিত রয়েছে মাত্র ০.১% এরও কম একক ক্ষারের পার্থক্যের (SNP) মধ্যে। বিজ্ঞান রাসায়নিকভাবে প্রমাণ করল: মানবজাতির মধ্যে কোনো জৈবিক জাতিভেদ নেই; আমরা সবাই একই অখণ্ড পরিবারের সন্তান।

*সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "মানবজাতির মহাকাব্য — হিউম্যান জিনোম প্রজেক্ট, ক্রেইগ ভেন্টর, ফ্রান্সিস কলিন্স ও শটগান সিকোয়েন্সিং"। জিনতত্ত্বের ইতিহাস, খণ্ড ১৩। https://shakilmahmud.com/bn/story-of-genetics-part-13-book-humankind-human-genome-project-venter-collins-bn/*

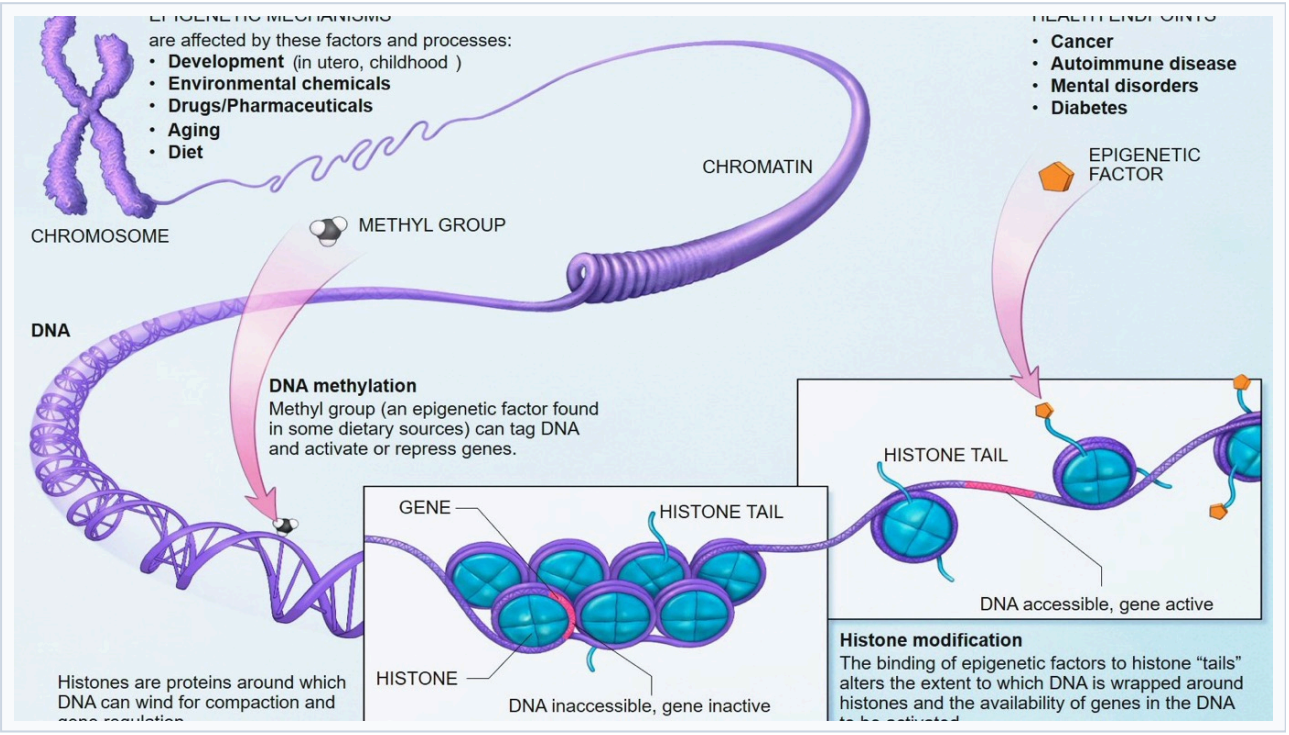
Shakil Mahmud • Research Monograph

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • চতুর্দশ খণ্ড

# ক্ষারজোড়ের বাইরে — কনরাড ওয়াডিংটন, হিস্টোন অ্যাসিটাইলেশন ও এপিজেনেটিক্স

*ক্ষারজোড়ের বাইরে — কনরাড ওয়াডিংটন, হিস্টোন অ্যাসিটাইলেশন ও এপিজেনেটিক্স*

735 শব্দ • November 2, 2026 • ওয়েব সংস্করণ




**চিত্র ১৪:** *এপিজেনেটিক্স: ডিএনএ মিথাইলেশন, হিস্টোন পরিবর্তন ও ক্রোম্যাটিন গঠনের মাধ্যমে জিন অভিব্যক্তির বংশানুক্রমিক নিয়ন্ত্রণ।*

হিউম্যান জিনোম প্রজেক্ট শেষ হওয়ার পর বিশ্বজুড়ে এক ধরণের ‘জিনগত নিয়তিবাদ’ চরম রূপ ধারণ করেছিল। সংবাদমাধ্যম প্রচার করতে লাগল যে মানুষের স্বাস্থ্য, রোগ, বুদ্ধিমত্তা এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সবই নাকি ডিএনএ-র ATGC অক্ষরের ভেতর চিরতরে নির্ধারিত হয়ে আছে। কিন্তু জীববিজ্ঞানের একটি পরম বাস্তব সত্য এই সরল ধারণাকে নিমেষেই ধূলিসাৎ করে দিল। ধরা যাক দুটি জমজ ভাইবোন—যাদের জন্ম হয়েছে একই নিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে এবং যাদের দেহের ডিএনএ ১০০% হুবহু এক। অথচ বয়স বাড়ার সাথে সাথে দেখা যায় একজন জমজ ডায়াবেটিস বা ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছে, অথচ অপরজন সম্পূর্ণ সুস্থ জীবন যাপন করছে। আরও বড় বিস্ময় হলো আমাদের নিজের শরীর: আপনার চোখের রেটিনা কোষ, মস্তিষ্কের নিউরন কোষ এবং যকৃতের হেপাটোসাইট কোষ—সবার ভেতর হুবহু একই ৩১০ কোটি ক্ষারের ডিএনএ লাইব্রেরি রয়েছে; অথচ তাদের আকার, প্রোটিন এবং কাজের ধরণ সম্পূর্ণ আলাদা। এই পরম রহস্যের উত্তর জিনের হার্ডওয়্যারে লুকানো ছিল না; তা নিহিত ছিল এক গতিশীল সফটওয়্যারের ভেতর, যার নাম **এপিজেনেটিক্স** (Epigenetics)।

## ওয়াডিংটনের এপিজেনেটিক ল্যান্ডস্কেপ

এপিজেনেটিক্সের আণবিক প্রমাণ পাওয়ার বহু পূর্বেই এক দূরদর্শী বিজ্ঞানী এর তাত্ত্বিক রূপরেখা এঁকেছিলেন। ১৯৪২ সালে ব্রিটিশ ভ্রূণতত্ত্ববিদ **কনরাড হ্যাল ওয়াডিংটন** (১৯০৫–১৯৭৫) 'এপিজেনেসিস' ও 'জেনেটিক্স' শব্দের মিলনে তৈরি করেন *এপিজেনেটিক্স* পরিভাষাটি—যার উদ্দেশ্য ছিল জিনোটাইপ কীভাবে জটিল শারীরিক ফিনোটাইপে রূপান্তরিত হয় তা ব্যাখ্যা করা।

ওয়াডিংটন তাঁর বিখ্যাত চিত্রের মাধ্যমে বিষয়টি ফুটিয়ে তুলেছিলেন: **এপিজেনেটিক ল্যান্ডস্কেপ**। একটি অনির্দিষ্ট স্টেম সেলকে কল্পনা করা হয়েছিল একটি মার্বেল হিসেবে, যা দাঁড়িয়ে আছে এক বন্ধুর পাহাড়ি ঢালের চূড়ায়। পাহাড়ের গা জুড়ে রয়েছে অসংখ্য শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট খাদ ও উপত্যকা। মাধ্যাকর্ষণের টানে মার্বেলটি যখন গড়িয়ে নিচে নামে, প্রতিটি মোড়ে সে একটি নির্দিষ্ট উপত্যকা বেছে নেয়। একটি খাদে পড়লে সে হয়ে যায় স্নায়ুকোষ; অপর খাদে পড়লে সে রূপ নেয় রক্তকণিকা বা পেশিকোষে। একবার একটি গভীর খাদে পড়ে গেলে মার্বেলটি আর নিজে নিজে ফিরে আসতে পারে না; অর্থাৎ কোষটি একটি স্থায়ী পরিচয়ে আবদ্ধ হয়ে যায়।

দীর্ঘদিন পর্যন্ত ওয়াডিংটনের এই পাহাড় ছিল কেবল একটি দার্শনিক উপমা। আজ আমরা জানি সেই উপত্যকাগুলোর আসল রূপ হলো কোষের ডিএনএ-তে ঘটে চলা সুনির্দিষ্ট রাসায়নিক পরিবর্তন: যাকে বলা হয় **এপিজিনোম**।

## আণবিক সংকেত: ডিএনএ মিথাইলেশন ও হিস্টোন কোড

কোষের নিউক্লিয়াসের ভেতর ডিএনএ কখনো আলগা সুতোর মতো ঘুরে বেড়ায় না। প্রায় দুই মিটার দীর্ঘ ডিএনএ অতি ক্ষুদ্র নিউক্লিয়াসের ভেতর প্রবেশ করার জন্য **হিস্টোন** নামক প্রোটিনের গোলাকার কাঠামোর চারপাশে শক্ত করে পেঁচিয়ে থাকে, যাকে বলা হয় **নিউক্লিওসোম**। এপিজিনোম পরিচালিত হয় দুটি প্রধান রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়:

### ১. ডিএনএ সাইটোসিন মিথাইলেশন

কোষের বিশেষ এনজাইম (DNMT) ডিএনএ-র সাইটোসিন ক্ষারের পাঁচ নম্বর কার্বনে একটি ক্ষুদ্র মিথাইল মূলক ($-CH_3$) যুক্ত করে তৈরি করে **৫-মিথাইলসাইটোসিন (**$5textmC$**)**। উচ্চতর স্তন্যপায়ী প্রাণীর ক্ষেত্রে এই মিথাইলেশন ঘটে মূলত $CpG$ স্থানে (যেখানে সাইটোসিনের পাশে গুয়ানিন থাকে)। কোনো জিনের প্রমোটরে থাকা CpG দ্বীপে যখন মিথাইল মূলক বসে যায়, তখন সেখানে ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টরগুলো আর বসতে পারে না; ফলে জিনটি তাৎক্ষণিকভাবে ঘুমিয়ে পড়ে (Gene Silencing)। সবচেয়ে বড় কথা, কোষ বিভাজনের সময় এই মিথাইল সংকেতগুলো অবিকলভাবে অপত্য কোষে স্থানান্তরিত হয়—যার ফলে কোষের অর্জিত স্মৃতি পরবর্তী প্রজন্মেও টিকে থাকে।

### ২. হিস্টোন কোড হাইপোথিসিস

২০০০ সালে ডেভিড অ্যালিস ও টমাস জেনুওয়েন প্রস্তাব করেন **হিস্টোন কোড তত্ত্ব**। হিস্টোন প্রোটিনের লেজের মতো অংশে বিভিন্ন রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে যা ক্রোম্যাটিনের সংকোচন-প্রসারণ নিয়ন্ত্রণ করে:

- **হিস্টোন অ্যাসিটাইলেশন:** যখন হিস্টোনের লাইসিন অ্যামিনো অ্যাসিডে অ্যাসিটাইল মূলক ($-COCH_3$) যুক্ত হয়, তখন হিস্টোনের ধনাত্মক চার্জ নষ্ট হয়ে যায়। ফলে ঋণাত্মক চার্জযুক্ত ডিএনএ-র সাথে তার বাঁধন আলগা হয়ে পড়ে। ডিএনএ খুলে গিয়ে শিথিল বা উন্মুক্ত রূপ (**ইউক্রোম্যাটিন**) ধারণ করে, যার ফলে আরএনএ পলিমারেজ সহজেই জিন থেকে প্রোটিন তৈরি করতে পারে। অন্যদিকে অ্যাসিটাইল গ্রুপ সরিয়ে নিলে ডিএনএ পুনরায় ঘন ও শক্ত হয়ে বন্ধ হয়ে যায় (**হেটারোক্রোম্যাটিন**)।
- **হিস্টোন মিথাইলেশন:** হিস্টোনের নির্দিষ্ট স্থানে মিথাইল যুক্ত হলে তা জিন চালু বা বন্ধ করার সংকেত হিসেবে কাজ করে। যেমন H3K4me3 সংকেত থাকলে জিন সক্রিয় থাকে, আর H3K27me3 সংকেত থাকলে জিনটি স্থায়ীভাবে অবরুদ্ধ হয়ে যায়।

Shakil Mahmud • Research Monograph

## পরিবেশের প্রভাব ও ভাগ্যের পরিবর্তন

ডিএনএ-র স্থায়ী অক্ষরের মতো এপিজেনেটিক সংকেতগুলো অনড় নয়; এরা পরিবেশ, খাদ্যভ্যাস, মানসিক চাপ এবং জীবনযাত্রার ওপর নির্ভর করে গতিশীলভাবে পরিবর্তিত হয়। ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত **অ্যাগাউটি ইঁদুর পরীক্ষায়** দেখা যায়—যেসব মা ইঁদুর জিনগতভাবে হলুদ রঙের ও অতিস্থূলকায় সন্তান জন্ম দিতে বাধ্য ছিল, গর্ভকালীন সময়ে তাদের ভিটামিন বি১২ এবং ফলিক অ্যাসিড সমৃদ্ধ মিথাইল খাবার খাওয়ানোর ফলে সেই একই ক্ষারানুক্রম থাকা সত্ত্বেও পরবর্তী প্রজন্মের ইঁদুরগুলো রোগমুক্ত, চিকন ও বাদামী রঙের হয়ে জন্ম নিল!

এপিজেনেটিক্সের সবচেয়ে চরম বিজয় অর্জিত হয় ২০০৬ সালে, যখন জাপানি বিজ্ঞানী **শিনিয়া ইয়ামানাকা** প্রমাণ করেন যে ওয়াডিংটনের পাহাড়ের গভীর খাদে নেমে যাওয়া মার্বেলটিকে আবার টেনে পাহাড়ে চূড়ায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব! একটি পরিণত ত্বকের কোষে মাত্র চারটি বিশেষ ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর (ইয়ামানাকা ফ্যাক্টর) প্রবেশ করিয়ে তিনি তার সমস্ত এপিজেনেটিক বাধা মুছে ফেলে তাকে পুনরায় ভ্রূণীয় স্টেম সেলে রূপান্তর করলেন—যার নাম দেওয়া হলো **ইনডিউসড প্লুরিপোটেন্ট স্টেম সেল (iPSC)**। ডিএনএ কোনো অপরিবর্তনীয় ভাগ্যলিপি নয়; তা হলো এক বিশাল পিয়ানো—যার চাবিগুলো বাজিয়ে তোলে এপিজেনেটিক্সের জীবন্ত সুর।

*সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "ক্ষারজোড়ের বাইরে — কনরাড ওয়াডিংটন, হিস্টোন অ্যাসিটাইলেশন ও এপিজেনেটিক্স"। জিনতত্ত্বের ইতিহাস, খণ্ড ১৪। https://shakilmahmud.com/bn/story-of-genetics-part-14-beyond-base-pairs-waddington-histone-epigenetics-bn/*

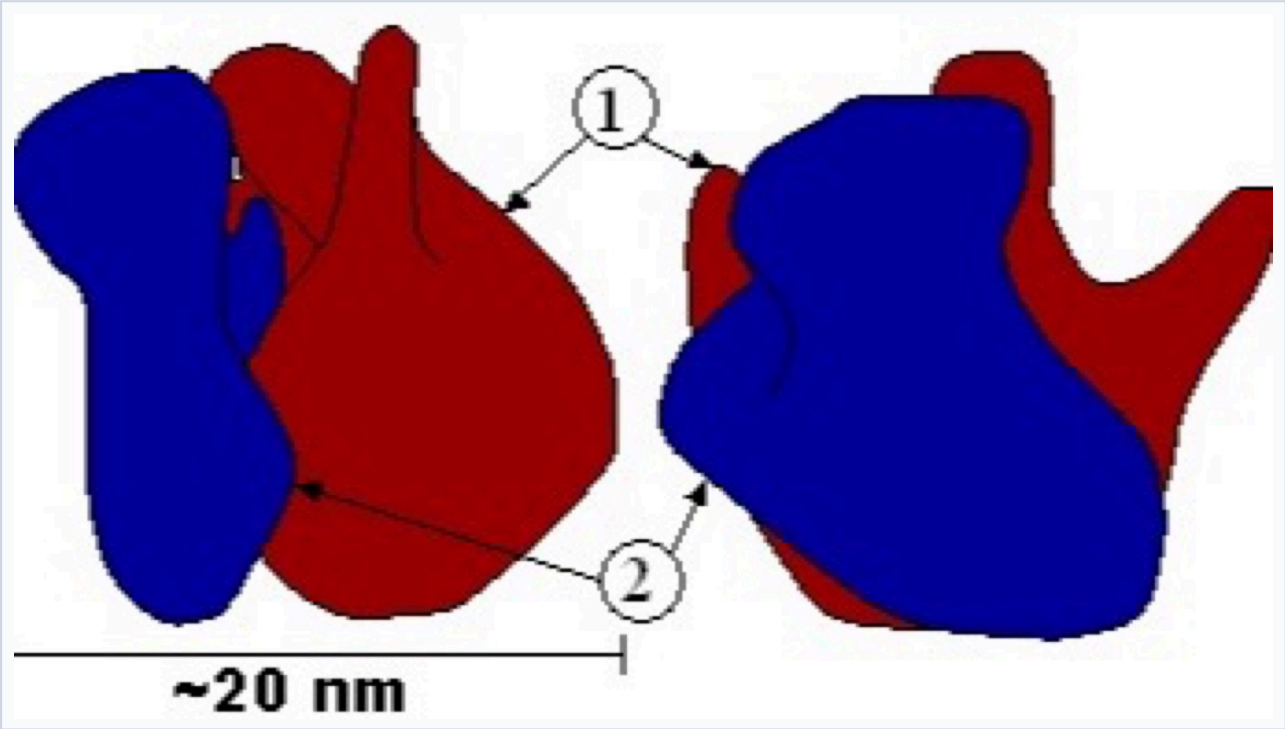
শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • পঞ্চদশ খণ্ড

# অচেনা ট্রান্সক্রিপ্টোম — নন-কোডিং আরএনএ, মাইক্রো-আরএনএ, স্প্লাইসিং ও এনকোড স্থাপত্য

*অচেনা ট্রান্সক্রিপ্টোম — নন-কোডিং আরএনএ, মাইক্রো-আরএনএ, স্প্লাইসিং ও এনকোড স্থাপত্য*

634 শব্দ • November 2, 2026 • ওয়েব সংস্করণ

❖




**চিত্র ১৫:** *রাইবোসোমের আণবিক রূপরেখা: মেসেঞ্জার আরএনএ থেকে প্রোটিন সংশ্লেষণকারী অনুঘটক রাইবোনিউক্লিওপ্রোটিন ইঞ্জিন।*

আণবিক জীববিজ্ঞানের প্রথম কয়েক দশক ধরে একটি চরম প্রোটিন-কেন্দ্রিক চিন্তা বিজ্ঞানীদের আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। মনে করা হতো আরএনএ হলো কেবল ডিএনএ-র এক অস্থায়ী বার্তাবাহক মাত্র—নিউক্লিয়াসের স্থায়ী ডিএনএ লাইব্রেরি থেকে তথ্য নকল করে সাইটোপ্লাজমের প্রোটিন তৈরির কারখানায় পৌঁছে দেওয়াই যার একমাত্র কাজ। ২০০১ সালে যখন হিউম্যান জিনোম প্রজেক্ট দেখাল যে **মানব জিনোমের ৯৮.৫% ডিএনএ-ই কোনো প্রোটিন তৈরি করে না**, তখন বহু খ্যাতনামা বিজ্ঞানী এই বিশাল অংশকে বিবর্তনের আবর্জনা বা **“জাঙ্ক ডিএনএ”** (Junk DNA) বলে উড়িয়ে দিলেন। কিন্তু পরবর্তী দুই দশকে বিজ্ঞানের এক নিঃশব্দ মহাবিপ্লব প্রমাণ করে দিল যে—সেই অন্ধকার অংশে কোনো আবর্জনা নেই; বরং সেখানে সক্রিয় রয়েছে এক জটিল ও গভীর জৈব জগৎ, যার নেতৃত্বে রয়েছে **নন-কোডিং আরএনএ (ncRNA)**।

Shakil Mahmud • Research Monograph

## বিভক্ত জিনের চমক: ইনট্রন ও স্প্লাইসোসোম

১৯৭৭ সালে এমআইটির **ফিলিপ শার্প** এবং কোল্ড স্প্রিং হারবারের **রিচার্ড রবার্টস** অ্যাডিনোভাইরাস নিয়ে কাজ করতে গিয়ে এক বিস্ময়কর সত্য আবিষ্কার করলেন। উচ্চতর জীবের জিনগুলো কোনো অবিচ্ছিন্ন বাক্য নয়। বরং জিনের অর্থপূর্ণ কোডিং অংশগুলোর (যাদের নাম দেওয়া হলো **এক্সন**) মাঝে মাঝে ঢুকে থাকে বিশাল বিশাল অর্থহীন অংশ—যাদের নাম দেওয়া হলো **ইনট্রন** (Introns)।

যখন একটি জিন অনুলিপিত হয়, তখন আরএনএ পলিমারেজ সম্পূর্ণ জিনটির একটি দীর্ঘ প্রি-এমআরএনএ তৈরি করে। এরপর কোষের ভেতর উপস্থিত হয় এক দানবীয় আণবিক কারখানা, যার নাম **স্প্লাইসোসোম** (Spliceosome)—যা পাঁচটি ক্ষুদ্র আরএনএ (snRNA) এবং শতাধিক প্রোটিনের সমন্বয়ে গঠিত। এই স্প্লাইসোসোম নিখুঁত কাঁচির মতো ইনট্রনগুলোকে কেটে বাদ দেয় এবং এক্সনগুলোকে একটির সাথে আরেকটি জুড়ে দিয়ে পরিণত মেসেঞ্জার আরএনএ তৈরি করে।

ইনট্রন থাকার আসল বৈপ্লবিক সুবিধা হলো **অল্টারনেটিভ স্প্লাইসিং** (Alternative Splicing)। বিভিন্ন কোষের প্রয়োজন অনুযায়ী এক্সনগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন বিন্যাসে জোড়া লাগিয়ে একটিমাত্র জিন থেকেই তৈরি করা যায় ডজন ডজন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রোটিন! উদাহরণস্বরূপ, ফলমাছির একটিমাত্র *Dscam* জিন বিকল্প স্প্লাইসিংয়ের মাধ্যমে **৩৮,০১৬টি ভিন্ন ভিন্ন প্রোটিন** তৈরি করতে পারে—যা মাছিটির দেহের মোট জিনের সংখ্যার দ্বিগুণেরও বেশি!

## আরএনএ জগৎ: অনুঘটক রাইবোজাইম

১৯৮০-এর দশকের প্রারম্ভে **টমাস চেক** এবং **সিডনি অল্টম্যান** এক যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য রসায়নে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন: **আরএনএ স্বয়ং এনজাইমের মতো রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটাতে পারে** (যার নাম দেওয়া হলো **রাইবোজাইম**)। চেক দেখালেন যে কিছু আরএনএ অণু কোনো প্রোটিনের সাহায্য ছাড়াই নিজের ভাঁজ করা ত্রিমাত্রিক রূপ ব্যবহার করে নিজের শরীর নিজেই কেটে জোড়া লাগাতে পারে।

এই আবিষ্কার জীববিজ্ঞানের প্রাচীনতম এক ধাঁধার সমাধান করল: *আগে কে এসেছিল—ডিএনএ (যা তৈরি হতে প্রোটিনের দরকার) নাকি প্রোটিন (যা তৈরি হতে ডিএনএ-র দরকার)?* উত্তর হলো **আরএনএ ওয়ার্ল্ড** (RNA World): পৃথিবীতে জীবনের আদি যুগে ডিএনএ বা প্রোটিন বলে কিছু ছিল না; আরএনএ একাধারে নিজের ভেতর তথ্য জমা রাখত আবার নিজেই এনজাইমের মতো জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া পরিচালনা করত। এমনকি ২০০০ সালে ভেঙ্কি রামকৃষ্ণান ও তাঁর সহকর্মীরা যখন রাইবোসোমের পারমাণবিক গঠন উন্মোচন করলেন, তখন দেখা গেল প্রোটিন তৈরির মূল কারখানা রাইবোসোম আসলে কোনো প্রোটিন নয়; এটি হলো আরএনএ দ্বারা গঠিত এক প্রাচীন **রাইবোজাইম**!

## মাইক্রো-আরএনএ বিপ্লব: অ্যামব্রোস ও রুভকুন

১৯৯৩ সালে *C. elegans* কৃমি নিয়ে কাজ করার সময় **ভিক্টর অ্যামব্রোস** এবং **গ্যারি রুভকুন** এক অদ্ভুত ঘটনা লক্ষ্য করলেন। লার্ভার বৃদ্ধির সময় নিয়ন্ত্রণকারী একটি জিন (*lin-4*) কোনো প্রোটিন তৈরি করে না; বরং তা তৈরি করে মাত্র ২২টি ক্ষারের অতি ক্ষুদ্র এক আরএনএ ফিতা। এই ক্ষুদ্র আরএনএ মেসেঞ্জার আরএনএ-র গায়ে আঠার মতো লেগে গিয়ে প্রোটিন তৈরির কাজ বন্ধ করে দেয়।

২০০০ সালে মানুষের দেহেও যখন এই ক্ষুদ্র আরএনএ আবিষ্কৃত হলো, বিশ্বজুড়ে শুরু হলো **মাইক্রো-আরএনএ (miRNA)** বিপ্লব। ডাইসার (Dicer) এনজাইম দিয়ে কাটা এই ২২ অক্ষরের অতিক্ষুদ্র আরএনএগুলো কোষের সাইটোপ্লাজমে ঘুরে বেড়ায় এবং মানুষের প্রায় ৬০% জিনের প্রোটিন তৈরির গতি নিয়ন্ত্রণ করে—ঠিক যেন এক অদৃশ্য আণবিক ট্রাফিক পুলিশ।

## এনকোড প্রজেক্ট: সক্রিয় মহাদেশ

২০১২ সালের সেপ্টেম্বরে আন্তর্জাতিক **এনকোড (ENCODE)** কনসোর্টিয়াম মানব জিনোমের দশ বছরব্যাপী গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করে বিশ্বকে স্তম্ভিত করে দিল:

> *“মানব জিনোমের সিংহভাগ—৮০% এরও বেশি অংশ—সক্রিয় জৈব-রাসায়নিক কার্যক্রমে লিপ্ত; তারা প্রতিনিয়ত আরএনএ তৈরি করছে, প্রোটিনের সাথে যুক্ত হচ্ছে এবং কোষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছে।”*
> *— এনকোড প্রজেক্ট কনসোর্টিয়াম, নেচার (২০১২)*

উন্মোচিত হলো হাজার হাজার **লং নন-কোডিং আরএনএ (lncRNA)**—যেমন *Xist* আরএনএ, যা নারীদেহের কোষে একটি সম্পূর্ণ X ক্রোমোজোমকে চাদরের মতো ঢেকে দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখে। জিনোম কোনো মরুভূমি নয় যেখানে কেবল কয়েকটি প্রোটিনের মরূদ্যান রয়েছে; জিনোম হলো এক জীবন্ত ও মুখরিত মহাদেশ—যেখানে নন-কোডিং আরএনএ হলো জীবনের সর্বোচ্চ চালিকাশক্তি।

*সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "অচেনা ট্রান্সক্রিপ্টোম — নন-কোডিং আরএনএ, মাইক্রো-আরএনএ, স্প্লাইসিং ও এনকোড স্থাপত্য"। জিনতত্ত্বের ইতিহাস, খণ্ড ১৫। https://shakilmahmud.com/bn/story-of-genetics-part-15-uncharted-transcriptome-noncoding-rna-microrna-encode-bn/*

Shakil Mahmud • Research Monograph

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • ষোড়শ খণ্ড

# জনসংখ্যার গণিত — হার্ডি-ওয়েনবার্গ, সিওয়াল রাইট, মটো কিমুরা ও নিউট্রাল থিওরি

*জনসংখ্যার গণিত — হার্ডি-ওয়েনবার্গ, সিওয়াল রাইট, মটো কিমুরা ও নিউট্রাল থিওরি*

611 শব্দ • November 2, 2026 • ওয়েব সংস্করণ

❖



**চিত্র ১৬:** *সিওয়াল রাইট: তাত্ত্বিক পপুলেশন জেনেটিক্স, জেনেটিক ড্রিফট ও অ্যাডাপটিভ ল্যান্ডস্কেপ তত্ত্বের জনক।*

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিবর্তন জীববিজ্ঞানে এক তীব্র গৃহযুদ্ধ চলছিল। একদিকে ছিলেন চার্লস ডারউইনের চিরাচরিত অনুসারীরা—যাঁরা বিশ্বাস করতেন প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে জীবের ধারাবাহিক ও ধীর গতির বাহ্যিক রূপান্তরের ফলেই নতুন প্রজাতির জন্ম হয়। অন্যদিকে ছিলেন মেন্ডেলের অনুসারীরা—যাঁরা মনে করতেন বংশগতি হলো কণিকাগত ও বিচ্ছিন্ন এবং হঠাৎ বড় বড় মিউটেশনের মাধ্যমেই বিবর্তন ঘটে। মঠের বাগানের মেন্ডেলীয় বংশগতির সাথে গ্যালাপাগোস দ্বীপের ডারউইনীয় প্রাকৃতিক নির্বাচনের ঐতিহাসিক মেলবন্ধন ঘটাতে প্রয়োজন ছিল এক নতুন গাণিতিক শাখার: যার নাম **তাত্ত্বিক পপুলেশন জেনেটিক্স** (Theoretical Population Genetics)।

## হার্ডি-ওয়েনবার্গ ভারসাম্য (১৯০৮)

১৯০৮ সালে ব্রিটিশ গণিতবিদ **জি. এইচ. হার্ডি** এবং জার্মান চিকিৎসক **ভিলহেল্ম ওয়েনবার্গ** স্বাধীনভাবে এই গাণিতিক ভিত্তির সূচনা করেন। মেন্ডেলের তত্ত্ব প্রকাশের পর অনেক সমালোচক যুক্তি দিয়েছিলেন যে প্রকট জিনগুলো যেহেতু শক্তিশালী, তাই সময়ের সাথে সাথে প্রকট বৈশিষ্ট্যটি পুরো জনসংখ্যায় ছড়িয়ে পড়বে এবং প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য চিরতরে হারিয়ে যাবে। হার্ডি ও ওয়েনবার্গ গণিত দিয়ে

দেখালেন যে এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

একটি বৃহৎ ও অবাধ প্রজননশীল জনসংখ্যায় দুটি অ্যালিলের ($A$ এবং $a$) অনুপাত যদি $p$ এবং $q$ হয় (যেখানে $p + q = ১$), তবে দ্বিপদী বিস্তারের নিয়মে পরবর্তী প্রজন্মের জিনোটাইপের অনুপাত হবে:

$$(p + q)^২ = p^২ + ২pq + q^২ = ১$$

- $p^২$: বিশুদ্ধ প্রকট জীবের অনুপাত ($AA$)
- $২pq$: সংকর হেটেরোজাইগাস জীবের অনুপাত ($Aa$)
- $q^২$: বিশুদ্ধ প্রচ্ছন্ন জীবের অনুপাত ($aa$)

যদি জনসংখ্যায় কোনো মিউটেশন না ঘটে, বাইরে থেকে কেউ প্রবেশ না করে, প্রাকৃতিক নির্বাচন অনুপস্থিত থাকে এবং প্রজনন সম্পূর্ণ দৈবচয়ন ভিত্তিক হয়—তবে **প্রজন্মের পর প্রজন্ম জিনের এই অনুপাত সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত থাকবে**। হার্ডি-ওয়েনবার্গ সূত্র জীববিজ্ঞানের পরম মানদণ্ড নির্ধারণ করে দিল: যদি কোনো জনসংখ্যায় জিনের অনুপাত পরিবর্তিত হয়, তবে বুঝতে হবে সেখানে বিবর্তন সক্রিয় রয়েছে।

## আধুনিক বিবর্তনীয় সংশ্লেষণ: ফিশার, হ্যালডেন ও রাইট

১৯২০ ও ৩০-এর দশকে রোনাল্ড ফিশার, জে. বি. এস. হ্যালডেন এবং আমেরিকান গণিতবিদ **সিওয়াল রাইট** (১৮৮৯–১৯৮৮) মেন্ডেলের সাথে ডারউইনের মিলন ঘটিয়ে জন্ম দিলেন **মডার্ন সিন্থেসিস**।

সিওয়াল রাইট এক অসাধারণ সত্য আবিষ্কার করলেন: **জেনেটিক ড্রিফট** (Genetic Drift)। জনসংখ্যা যদি ছোট বা বিচ্ছিন্ন হয়, তবে সেখানে প্রাকৃতিক নির্বাচন জয়ী হতে পারে না; বরং জননকোষের মিলনের সময় ভাগ্যের খেলায় আকস্মিকভাবে কোনো কোনো জিন চিরতরে হারিয়ে যায় অথবা কোনো ক্ষতিকর জিনও ভাগ্যের জোরে ১০০% স্থায়ী হয়ে যেতে পারে।

রাইট বিবর্তনকে কল্পনা করেছিলেন একটি **অ্যাডাপটিভ ল্যান্ডস্কেপ** বা মানচিত্র হিসেবে—যেখানে পাহাড়ের উচ্চতা প্রকাশ করে জীবের টিকে থাকার উপযোগিতা। প্রাকৃতিক নির্বাচন সবসময় জীবকে নিকটবর্তী পাহাড়ের চূড়ায় তুলে দেয়, কিন্তু মাঝে থাকা নিচু উপত্যকা পেরিয়ে আরও উঁচুতে নিয়ে যেতে পারে কেবল জেনেটিক ড্রিফটের এলোমেলো ঝাঁকুনি।

## মটো কিমুরা ও নিউট্রাল থিওরি (১৯৬৮)

১৯৬০-এর দশকের শেষের দিকে যখন বিভিন্ন প্রাণীর প্রোটিন ও ডিএনএ সিকোয়েন্স করা হলো, বিজ্ঞানীরা এক অভাবনীয় দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলেন: লক্ষ লক্ষ বছর ধরে বিভিন্ন প্রজাতির ডিএনএ-তে ক্ষারের পরিবর্তন ঘটছে ঘড়ির কাঁটার মতো এক অবিশ্বাস্য সুষম গতিতে—যাকে পল পলিং ও এমিল জুকারক্যান্ডল নাম দিলেন **মলিকিউলার ক্লক** (Molecular Clock)।

প্রাকৃতিক নির্বাচন যদি প্রতিটি পরিবর্তনের চালিকাশক্তি হতো, তবে এই ঘড়ির কাঁটার গতি এত নিখুঁত হওয়া অসম্ভব ছিল; কারণ পরিবেশের পরিবর্তন কোনো নির্দিষ্ট ছকে ঘটে না। ১৯৬৮ সালে জাপানি তাত্ত্বিক বিজ্ঞানী **মটো কিমুরা** (১৯২৪–১৯৯৪) উপস্থাপন করলেন আধুনিক জীববিজ্ঞানের অন্যতম বৈপ্লবিক তত্ত্ব: **দ্য নিউট্রাল থিওরি অব মলিকিউলার ইভোলিউশন**:

Shakil Mahmud • Research Monograph

> *“আণবিক পর্যায়ে ডিএনএ ও প্রোটিনের যে হাজার হাজার পরিবর্তন ঘটে—তার সিংহভাগই কোনো প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফসল নয়; বরং তা ঘটে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও ক্ষতিকরহীন মিউটেশনের ওপর জেনেটিক ড্রিফটের দৈবচয়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।”*
> *— মটো কিমুরা, নেচার (১৯৬৮)*

কিমুরা বললেন, জীবের বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হয়তো প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমেই গঠিত হয়; কিন্তু ডিএনএ-র গভীরে থাকা সমার্থক কোডন ও নন-কোডিং অংশে ঘটা কোটি কোটি পরিবর্তন জীবের জীবন-মৃত্যুতে কোনো ভূমিকা রাখে না। এই নিরপেক্ষ মিউটেশনগুলো সময়ের সাথে সাথে এলোমেলোভাবে সঞ্চিত হতে থাকে। কিমুরা গাণিতিকভাবে প্রমাণ করলেন যে নিরপেক্ষ পরিবর্তনের সঞ্চয়ের হার ($k$) সরাসরি নিরপেক্ষ মিউটেশনের হারের ($mu$) সমান—যা জনসংখ্যার আকারের ওপর মোটেও নির্ভর করে না!

কিমুরার এই সমীকরণ মলিকিউলার ঘড়ির রহস্য উন্মোচন করল। পপুলেশন জেনেটিক্স প্রমাণ করল—প্রকৃতির হিংস্র জীবন সংগ্রামের অন্তরালে বয়ে চলেছে নিরপেক্ষ জিনের এক শান্ত ও অবিরাম নদী, যা লক্ষ কোটি বছর ধরে মহাকালের সময় গণনা করে চলেছে।

*সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "জনসংখ্যার গণিত — হার্ডি-ওয়েনবার্গ, সিওয়াল রাইট, মটো কিমুরা ও নিউট্রাল থিওরি"। জিনতত্ত্বের ইতিহাস, খণ্ড ১৬।*
*https://shakilmahmud.com/bn/story-of-genetics-part-16-calculus-populations-hardy-weinberg-wright-kimura-neutral-bn/*

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • সপ্তদশ খণ্ড

# প্রাচীন ডিএনএ-র পুনরুত্থান — সভান্তে প্যাবো, প্যালিয়োজেনোমিক্স ও ডেনিসোভান রহস্য

*প্রাচীন ডিএনএ-র পুনরুত্থান — সভান্তে প্যাবো, প্যালিয়োজেনোমিক্স ও ডেনিসোভান রহস্য*

642 শব্দ • November 2, 2026 • ওয়েব সংস্করণ



**চিত্র ১৭:** *সভান্তে প্যাবো: প্রাচীন জীবাশ্ম থেকে ডিএনএ উদ্ধারকারী প্যালিয়োজেনোমিক্সের জনক ও নিয়ান্ডারথাল জিনোম আবিষ্কারক নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী।*

এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে মানুষের বিবর্তন বোঝার একমাত্র উপায় ছিল প্রাচীন গুহা থেকে পাওয়া ফসিল: মাটির নিচে পাথরে পরিণত হওয়া খুলি, চোয়ালের দাঁত কিংবা পাথরের প্রাচীন অস্ত্র। জীবাশ্মবিদরা বিতর্কে লিপ্ত ছিলেন—আধুনিক মানুষ (*Homo sapiens*) আফ্রিকা থেকে বের হয়ে নিয়ান্ডারথালের মতো অন্যান্য বিলুপ্ত মানুষকে কোনো রকম যৌন মিলন ছাড়াই সম্পূর্ণ প্রতিস্থাপন করেছিল, নাকি তাদের মাঝে রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছিল? কিন্তু পাথরের কঙ্কাল দেখে এই বিতর্কের চূড়ান্ত সমাধান করা অসম্ভব ছিল; কারণ কঙ্কালের আকার পরিবেশের ওপর নির্ভর করে বদলে যেতে পারে। মানবজাতির আসল কুলজি উদ্ধার করতে প্রয়োজন ছিল প্রাচীন মানুষের শরীরের আসল রাসায়নিক সংকেত—তাদের ডিএনএ পাঠ করা। দীর্ঘকাল ধরে একে ভাবা হতো সম্পূর্ণ অসম্ভব: একটি জীব মারা যাওয়ার পর তার কোষের এনজাইম এবং মাটির ব্যাকটেরিয়া কয়েক বছরের মধ্যে ডিএনএ-কে খেয়ে শেষ করে ফেলে। সেই অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন সুইডিশ জিনবিজ্ঞানী **সভান্তে প্যাবো** (জন্ম ১৯৫৫)।

Shakil Mahmud • Research Monograph

## ক্ষয়ের পদার্থবিজ্ঞান: প্রাচীন ডিএনএ-র পুনরুত্থান

জার্মানির লাইপজিগে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইনস্টিটিউট ফর ইভোলিউশনারি অ্যানথ্রোপোলজিতে বসে প্যাবো প্রতিষ্ঠা করলেন বিজ্ঞানের এক নতুন শাখা: **প্যালিয়োজেনোমিক্স** (Paleogenomics)। চল্লিশ হাজার বছর পুরানো বরফ যুগের হাড় থেকে উদ্ধার করা ডিএনএ আধুনিক ডিএনএ-র মতো দীর্ঘ ও অক্ষত ছিল না; তা ছিল মাত্র ৩০ থেকে ৭০টি ক্ষারের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এক জীর্ণ টুকরো। সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল, জীবাশ্মের হাড়ের ৯৯% ডিএনএ-ই ছিল মাটির ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের।

আরও মারাত্মক বিপদ ছিল **আধুনিক মানুষের দূষণ**: খননকারী বিজ্ঞানী বা ল্যাবের টেকনিশিয়ানের একটিমাত্র মাথার খুশকি বা ঘামের ফোঁটা থেকে কোটি কোটি আধুনিক ডিএনএ এসে প্রাচীন জীবাশ্মের সামান্য চিহ্নকে নিমেষেই ঢেকে দিতে পারত। এই বিপদ এড়াতে প্যাবো তৈরি করলেন মহাকাশযানের মতো আল্ট্রা-ক্লিন ল্যাবরেটরি—যেখানে বাতাস সবসময় উচ্চচাপে বাইরে ঠেলে দেওয়া হতো এবং গবেষকরা নভোচারীদের মতো বিশেষ পোশাক পরে অতিবেগুনী রশ্মির নিচে কাজ করতেন।

প্যাবো প্রাচীন ডিএনএ-র একটি অনন্য **রাসায়নিক ক্ষতের রূপরেখা** আবিষ্কার করলেন:

- **হাইড্রোলাইসিস ও খণ্ডন:** হাজার হাজার বছর ধরে পানির সংস্পর্শে ডিএনএ-র ক্ষার খসে গিয়ে সুতোটি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়।
- **সাইটোসিন ডিমিনেশন:** বরফ যুগের শীতল গুহায় শতাব্দীর পর শতাব্দী পড়ে থাকতে থাকতে সাইটোসিন ক্ষার থেকে অ্যামিন মূলক খসে গিয়ে তা রূপান্তরিত হয় **ইউরাসিল** ($U$)-এ। সিকোয়েন্সিং করার সময় পলিমারেজ এনজাইম এই ইউরাসিলকে পড়ে থাইমিন ($T$) হিসেবে। ফলে আসল প্রাচীন ডিএনএ-র দুই মাথায় সবসময় প্রচুর পরিমাণে **সাইটোসিন থেকে থাইমিন (**$CrightarrowT$**) পরিবর্তন** দেখতে পাওয়া যায়।

এই নির্দিষ্ট ক্ষতের প্যাটার্ন কম্পিউটার দিয়ে মেপে প্যাবো শতভাগ নিশ্চিত হলেন যে তাঁর উদ্ধার করা অণুগুলো কোনো আধুনিক ল্যাব দূষণ নয়, বরং তা হাজার হাজার বছর আগের বরফ যুগের আসল ফসিল থেকে আসা জীবন্ত অণু!

## নিয়ান্ডারথাল জিনোম (২০১০) ও রক্তে মিশে থাকা ইতিহাস

২০১০ সালের মে মাসে ক্রোয়েশিয়ার ভিন্দিজা গুহা থেকে পাওয়া তিনটি নিয়ান্ডারথাল নারী কঙ্কালের সামান্য গুঁড়ো থেকে প্যাবোর দল পৃথিবীর সামনে উন্মোচন করলেন **নিয়ান্ডারথালের প্রথম পূর্ণাঙ্গ জিনোম মানচিত্র**। যখন তাঁরা সেই প্রাচীন ডিএনএ-কে আধুনিক মানুষের সাথে মিলিয়ে দেখলেন, সারা বিশ্বের নৃতত্ত্ব জগৎ এক তীব্র আলোড়নে কেঁপে উঠল!

বিজ্ঞানীরা প্রমাণ পেলেন নিয়ান্ডারথালরা সম্পূর্ণ আলাদাভাবে হারিয়ে যায়নি। আফ্রিকা মহাদেশের বাইরের প্রতিটি আধুনিক মানুষের (ইউরোপীয়, এশীয়, আদিবাসী আমেরিকান ও অস্ট্রেলীয়) শরীরে আজও **১% থেকে ২% নিয়ান্ডারথালের ডিএনএ** বেঁচে রয়েছে! আজ থেকে ষাট হাজার বছর আগে আধুনিক মানুষ যখন আফ্রিকা ছেড়ে মধ্যপ্রাচ্যে প্রবেশ করেছিল, তখন সেখানে বসবাসরত নিয়ান্ডারথালদের সাথে তাদের মিলন ঘটেছিল। এই প্রাচীন জিন আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং শীতপ্রধান দেশের ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় টিকে থাকার জন্য বিশেষ কেরাটিন তৈরিতে সাহায্য করেছিল।

## ডেনিসোভান রহস্য: একটিমাত্র আঙুলের হাড়

২০১০ সালে সাইবেরিয়ার আলতাই পর্বতমালার ডেনিসোভা গুহা থেকে পাওয়া একটি মানব শিশুর কনিষ্ঠা আঙুলের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এক টুকরো হাড় প্যাবোর ল্যাবে পৌঁছাল। সেই হাড় থেকে উদ্ধার করা ডিএনএ সিকোয়েন্স করে বিজ্ঞানীরা হতবাক হয়ে গেলেন: এটি নিয়ান্ডারথালও নয়, আবার আধুনিক মানুষও নয়; এটি ছিল মানুষের সম্পূর্ণ অজানা এক তৃতীয় প্রজাতি: **ডেনিসোভান** (Denisovans)!

আজকের মেলানেশীয় ও অস্ট্রেলীয় আদিবাসীদের রক্তে আজও প্রায় **৪% থেকে ৬% ডেনিসোভান ডিএনএ** বইছে। সবচেয়ে রোমাঞ্চকর তথ্য হলো, আধুনিক তিব্বতিরা হিমালয়ের উচ্চতায় অক্সিজেন স্বল্পতার মধ্যেও সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে পারে যে জিনের কারণে (**EPAS1** জিন)—সেই জিনের বিশেষ রূপটি তিব্বতিরা সরাসরি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিল এই প্রাচীন ডেনিসোভানদের কাছ থেকে! বিলুপ্ত মানুষের জিনোম উদ্ধার এবং মানবজাতির প্রাচীন মিলনের রহস্য উন্মোচনের জন্য ২০২২ সালে সভান্তে প্যাবো চিকিৎসাবিজ্ঞানে একক নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। বিজ্ঞান প্রমাণ করল—আমাদের হারিয়ে যাওয়া পূর্বপুরুষরা মাটির নিচে হারিয়ে যাননি; তাঁদের রক্ত আজও আমাদের ধমনীতে স্পন্দিত হচ্ছে।

*সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "প্রাচীন ডিএনএ-র পুনরুত্থান — সভান্তে প্যাবো, প্যালিয়োজেনোমিক্স ও ডেনিসোভান রহস্য"। জিনতত্ত্বের ইতিহাস, খণ্ড ১৭। https://shakilmahmud.com/bn/story-of-genetics-part-17-resurrection-ancient-dna-paabo-paleogenomics-denisovan-bn/*

Shakil Mahmud • Research Monograph

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • অষ্টাদশ খণ্ড

# প্রোগ্রামযোগ্য আণবিক স্ক্যালপেল — জেনিফার ডাউডনা, ইমানুয়েল চার্পেনশিয়ে ও ক্রিসপার-ক্যাস৯

*প্রোগ্রামযোগ্য আণবিক স্ক্যালপেল — জেনিফার ডাউডনা, ইমানুয়েল চার্পেনশিয়ে ও ক্রিসপার-ক্যাস৯*

678 শব্দ • November 2, 2026 • ওয়েব সংস্করণ



**চিত্র ১৮:** *জেনিফার ডাউডনা ও ইমানুয়েল চার্পেনশিয়ে: ক্রিসপার-ক্যাস৯ প্রোগ্রামযোগ্য জিনোম এডিটিং প্রযুক্তির আবিষ্কারক নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী।*

১৯৭০-এর দশকে রিকম্বিন্যান্ট ডিএনএ আবিষ্কারের পর চার দশক ধরে বিজ্ঞানীরা টেস্টটিউবে ডিএনএ কাটাছেঁড়া করতে পেরেছিলেন এবং অন্য জীবের জিন কোষে ঢোকাতে পেরেছিলেন। কিন্তু আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের কাছে একটি পরম স্বপ্ন তখনো অধরা রয়ে গিয়েছিল: **জীবন্ত মানবকোষের ভেতর ঢুকে নির্দিষ্ট কোনো ক্ষারকে নির্ভুলভাবে সম্পাদনা বা ঠিক করা**। ধরা যাক কোনো রোগী সিকেল-সেল অ্যানিমিয়া বা হান্টিংটন্স ডিজিজে আক্রান্ত; তার সম্পূর্ণ ৩১০ কোটি ক্ষারের মধ্যে মাত্র একটি বা দুটি ক্ষার ভুল বানানে লেখা আছে। প্রচলিত জেনেটিক পদ্ধতিতে সেই একটিমাত্র ক্ষারকে খুঁজে ঠিক করা ছিল পাহাড় সমান কঠিন, অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ। চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রয়োজন ছিল এমন এক আণবিক স্ক্যালপেল বা কাঁচি—যা জটিল প্রোটিনের বদলে সাধারণ ক্ষারের সংকেত পড়ে যেকোনো জিনের কাছে নির্ভুলভাবে পৌঁছে যেতে পারে। ২০১২ সালে সেই পরম কাঁচিটি আবিষ্কৃত হলো কোনো বড় ওষুধ কোম্পানির গবেষণাগার থেকে নয়; বরং ব্যাকটেরিয়ার শরীরের প্রাচীন এক রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার পাঠোদ্ধার করে: যার নাম **ক্রিসপার-ক্যাস৯ (CRISPR-Cas9)**।

## ব্যাকটেরিয়ার রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা

১৯৮৭ সালে জাপানি বিজ্ঞানীরা *ই. কোলাই* ব্যাকটেরিয়ার ডিএনএ-তে লক্ষ্য করলেন এক অদ্ভুত পুনরাবৃত্তিমূলক ক্ষারের বিন্যাস—যেখানে ২৯টি পুনরাবৃত্ত ক্ষারের পর পর ছিল ৩২টি সম্পূর্ণ ভিন্ন ক্ষারের ফাঁক বা স্পেসার। ২০০০ সালের প্রারম্ভে স্প্যানিশ বিজ্ঞানী ফ্রান্সিসকো মোজিকা আবিষ্কার করলেন যে এই বিন্যাসটি সকল ব্যাকটেরিয়ার শরীরেই উপস্থিত এবং তিনি এর নাম দিলেন **ক্রিসপার** (CRISPR)। সবচেয়ে বড় চমক ছিল: সেই স্পেসার অংশগুলোর ক্ষারানুক্রম হুবহু মিলে যাচ্ছিল আক্রমণকারী ভাইরাস বা ব্যাকটেরিওফাযের ডিএনএ-র সাথে!

উন্মোচিত হলো ব্যাকটেরিয়ার নিজস্ব এক অপূর্ব অ্যাডাপটিভ ইমিউন সিস্টেম:

1. **মেমোরি সংরক্ষণ:** ভাইরাস যখন ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করে, ব্যাকটেরিয়ার এনজাইম ভাইরাসের ডিএনএ-র একটি ছোট অংশ কেটে নিয়ে নিজের ক্রিসপার ডিএনএ-র ভেতর ‘আসামির ছবি’র মতো স্থায়ীভাবে বাঁধাই করে রেখে দেয়।
2. **আরএনএ প্রকাশ:** এই ছবিগুলো থেকে ছোট ছোট **ক্রিসপার আরএনএ (crRNA)** তৈরি হয়।
3. **আক্রমণ প্রতিহতকরণ:** এই আরএনএ যুক্ত হয় **ক্যাস (Cas)** নামক এক বিধ্বংসী কাঁচি প্রোটিনের সাথে। সেই ভাইরাস যখন দ্বিতীয়বার আক্রমণ করে, আরএনএ ক্ষণিকের মধ্যে ভাইরাসের ডিএনএ চিনে ফেলে এবং ক্যাস প্রোটিন ক্ষেপণাস্ত্রের মতো ছুটে গিয়ে ভাইরাসের ডিএনএ টুকরো টুকরো করে কেটে ধ্বংস করে দেয়।

## ডাউডনা ও চার্পেনশিয়ে: একক গাইড আরএনএ বিপ্লব

২০১১ সালে পুয়ের্তো রিকোর এক সম্মেলনে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিস্ট **জেনিফার ডাউডনা** (জন্ম ১৯৬৪) এবং ফরাসি অণুজীববিজ্ঞানী **ইমানুয়েল চার্পেনশিয়ে** (জন্ম ১৯৬৮)-এর সাক্ষাৎ হয়। চার্পেনশিয়ে আবিষ্কার করেছিলেন যে *স্ট্রেপ্টোকক্কাস পাইয়োজিনেস* ব্যাকটেরিয়ার টাইপ-২ ক্রিসপারে crRNA ছাড়াও আরও একটি ছোট আরএনএ প্রয়োজন হয়: যার নাম **ট্রেসার আরএনএ (tracrRNA)**, যা মিলে বিশাল **Cas9** এনজাইমকে পরিচালিত করে।

দুই বিজ্ঞানী যৌথভাবে গবেষণায় নামলেন। তাঁরা দেখলেন Cas9 এনজাইমের ভেতর দুটি আলাদা কাঁচি রয়েছে: যা ডিএনএ-র দুই সুতোকেই কেটে দেয় ঠিক সেই জায়গায় যেখানে গাইড আরএনএ গিয়ে বসে—যদি তার পাশে একটি তিন অক্ষরের নির্দেশক বা **প্যাম (PAM: NGG)** থাকে।

এরপর ডাউডনা ও চার্পেনশিয়ে করলেন এক অবিশ্বাস্য ইঞ্জিনিয়ারিং। প্রাকৃতিকভাবে প্রয়োজনীয় দুটি আলাদা আরএনএ-কে তাঁরা গবেষণাগারে জুড়ে দিয়ে তৈরি করলেন একটিমাত্র অবিচ্ছিন্ন কৃত্রিম আরএনএ: **সিঙ্গেল-গাইড আরএনএ (sgRNA)**।

> *“আমরা বুঝতে পারলাম এই ব্যবস্থাকে জিনোম সম্পাদনার এক চূড়ান্ত হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব... আপনি কেবল গাইড আরএনএ-র প্রথম বিশটি অক্ষর বদলে দিন যে জিনের কাছে আপনি যেতে চান; Cas9 সোজা সেখানে গিয়ে ঠিক সেই জায়গায় নিখুঁতভাবে ডিএনএ কেটে ফেলবে।”*
> *— জেনিফার ডাউডনা ও ইমানুয়েল চার্পেনশিয়ে, সায়েন্স (১৭ আগস্ট ২০১২)*

## জিনোম পুনর্লিখনের নতুন যুগ

মাত্র দশ ডলার খরচ করে অনলাইনে বিশ অক্ষরের একটি আরএনএ অর্ডার করলেই যে কেউ মানবকোষের যেকোনো একটি নির্দিষ্ট জিনকে লক্ষ্য করে কেটে ফেলার ক্ষমতা পেয়ে গেল। ২০১৩ সালের জানুয়ারিতে এমআইটির **ফেং ঝাং** এবং হার্ভার্ডের **জর্জ চার্চ** প্রমাণ করলেন যে ক্রিসপার মানুষের জীবিত কোষের ভেতর অবিশ্বাস্য দক্ষতায় জিন কেটে ফেলতে পারে।

Shakil Mahmud • Research Monograph

Cas9 যখন একটি নির্দিষ্ট জিনে দ্বিসূত্রক কাটা (Double-strand break) তৈরি করে, তখন কোষের নিজস্ব মেরামত ব্যবস্থা দুটি উপায়ে তা জোড়া লাগাতে ছুটে আসে:

- **নন-হোমোলোগাস এন্ড জয়েনিং (NHEJ):** কোনো ছাঁচ ছাড়া কোষ তাড়াহুড়ো করে ভাঙা দুই মাথা জুড়ে দিতে গিয়ে কিছু ক্ষার ভুলবশত বাদ দেয় বা যোগ করে। ফলে একটি ক্ষতিকর জিন স্থায়ীভাবে অকেজো বা 'নকআউট' হয়ে যায়।
- **হোমোলজি-ডিরেক্টেড রিপেয়ার (HDR):** বিজ্ঞানীরা যদি কাটার সাথে সাথে একটি সুস্থ সঠিক ডিএনএ টুকরো ভেতরে দিয়ে দেন, তবে কোষ সেই সঠিক টুকরোটি দেখে দেখে নিখুঁতভাবে নিজের ভুল জিনটিকে সারিয়ে তোলে!

২০২০ সালে জেনিফার ডাউডনা ও ইমানুয়েল চার্পেনশিয়ে রসায়নে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন—বিজ্ঞানে যা প্রথম কোনো একক নারী জুটির নোবেল জয়। মাত্র এক দশকের মধ্যে ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে বাজারে এলো বিশ্বের প্রথম ক্রিসপার-ভিত্তিক ওষুধ **ক্যাসগেভি** (Casgevy), যা দিয়ে সিকেল-সেল রোগের জন্মগত অভিশাপ থেকে মানুষকে সম্পূর্ণ নিরাময় করা সম্ভব হলো। মানবজাতি অবশেষে জীবনের ভাষার ওপর এক সার্বভৌম ও শক্তিশালী ওয়ার্ড প্রসেসর লাভ করল।

*সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "প্রোগ্রামযোগ্য আণবিক স্ক্যালপেল — জেনিফার ডাউডনা, ইমানুয়েল চার্পেনশিয়ে ও ক্রিসপার-ক্যাস৯"। জিনতত্ত্বের ইতিহাস, খণ্ড ১৮। https://shakilmahmud.com/bn/story-of-genetics-part-18-programmable-scalpel-doudna-charpentier-crispr-cas9-bn/*

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • ঊনবিংশ খণ্ড

# কৃত্রিম ক্রোমোজোম — ক্রেইগ ভেন্টর, JCVI-syn3.0 ও সিন্থেটিক জীবনের সূচনা

*কৃত্রিম ক্রোমোজোম — ক্রেইগ ভেন্টর, JCVI-syn3.0 ও সিন্থেটিক জীবনের সূচনা*

637 শব্দ • November 2, 2026 • ওয়েব সংস্করণ

❖



**চিত্র ১৯:** *জে. ক্রেইগ ভেন্টর: প্রথম সম্পূর্ণ কৃত্রিম ডিএনএ সমৃদ্ধ সিন্থেটিক জীবকোষ 'JCVI-syn3.0' এর স্রষ্টা।*

পৃথিবীতে জীবনের চারশো কোটি বছরের ইতিহাসে প্রতিটি জীবের জন্ম হয়েছিল এক অবিচ্ছিন্ন জীববৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলের মাধ্যমে: একটি পূর্ববর্তী কোষ বিভাজিত হয়ে নতুন কোষের জন্ম দেয় এবং কোটি কোটি বছরের প্রাকৃতিক বিবর্তনে অর্জিত জিনোম বংশপরম্পরায় অপত্য কোষে স্থানান্তরিত হয়। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিজ্ঞানীদের এই প্রাচীন কাপড়ের ভেতর কয়েকটি সুতো বদলানোর ক্ষমতা দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু কাপড়টি ছিল প্রকৃতির আদি সৃষ্টি। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিজ্ঞানীরা এক অবিশ্বাস্য ও চরম লক্ষ্য নির্ধারণ করলেন: *মানুষ কি গবেষণাগারের চারটি সাধারণ রাসায়নিক বোতল থেকে সম্পূর্ণ একটি নতুন জীব সৃষ্টি করতে পারে—যার সমস্ত ডিএনএ লেখা হবে কম্পিউটারের মনিটরে এবং তা কৃত্রিমভাবে তৈরি করে প্রাণহীন কোষে ঢুকিয়ে দিলে শুরু হবে স্বাধীন জীবনের স্পন্দন?* সেই ঐতিহাসিক সীমানা অতিক্রম করেছিলেন **জে. ক্রেইগ ভেন্টর**, নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী **হ্যামিল্টন স্মিথ** এবং অণুজীববিদ **ক্লাইড হাচিসন**।

Shakil Mahmud • Research Monograph

## JCVI-syn1.0: প্রথম সিন্থেটিক জীবের জন্ম (২০১০)

ভেন্টর তাঁর পরীক্ষার জন্য বেছে নিয়েছিলেন *মাইকোপ্লাজমা মাইকয়ডিস* নামক এক ক্ষুদ্র পরজীবী ব্যাকটেরিয়াকে, যার গোলাকার জিনোমে ছিল মাত্র ১০ লক্ষ ৮০ হাজার ক্ষারজোড়। কিন্তু কোনো সিন্থেটিক মেশিন একবারে কয়েক হাজার অক্ষরের বেশি ডিএনএ নির্ভুলভাবে তৈরি করতে পারত না।

এই অসম্ভবকে সম্ভব করতে তাঁরা উদ্ভাবন করলেন এক অভূতপূর্ব ধাপভিত্তিক পদ্ধতি:

1. **রাসায়নিক টুকরো তৈরি:** তাঁরা গবেষণাগারে ১,০৮০ ক্ষারের ১,০৭৮টি টুকরো তৈরি করলেন। কৃত্রিম প্রমাণ রাখতে তাঁরা নন-কোডিং অংশে বিখ্যাত বিজ্ঞানী রিচার্ড ফাইনম্যানের উক্তি ও ওয়েবসাইটের ঠিকানা কোডিং আকারে লিখে দিলেন (Watermark)।
2. **ইস্ট কোষের ভেতর জোড়া লাগানো:** সাধারণ বেকার্স ইস্ট (*Saccharomyces cerevisiae*) কোষের ডিএনএ জোড়া লাগানোর অবিশ্বাস্য ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে তাঁরা ধাপে ধাপে টুকরোগুলোকে ১০ হাজার, ১ লক্ষ এবং পরিশেষে একটি সম্পূর্ণ **১০,৭৭,৯৪৭ ক্ষারের অখণ্ড কৃত্রিম ক্রোমোজোমে** পরিণত করলেন।
3. **জিনোম প্রতিস্থাপন:** এরপর সেই সম্পূর্ণ কৃত্রিম ক্রোমোজোমটিকে আলতো করে বের করে *মাইকোপ্লাজমা ক্যাপ্রিকোলাম* নামক ভিন্ন একটি ব্যাকটেরিয়ার কোষের ভেতর ঢুকিয়ে দেওয়া হলো, যার নিজস্ব ডিএনএ আগে থেকেই সরিয়ে ফেলা হয়েছিল।

২০১০ সালের মে মাসে সেই কৃত্রিম ক্রোমোজোমটি “বুট আপ” করল! কৃত্রিম ডিএনএ নিজের আরএনএ ও প্রোটিন তৈরি করা শুরু করল এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যে গ্রহীতা কোষের সমস্ত পুরানো উপাদান ধ্বংস করে কৃত্রিম প্রোটিন দিয়ে কোষটি পূর্ণ হয়ে গেল। কোষটি স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠল, বিভাজিত হলো এবং নিজের মতো বংশবৃদ্ধি শুরু করল। ভেন্টর এর নাম দিলেন **JCVI-syn1.0**:

> *“এটি পৃথিবীর প্রথম আত্ম-অনুলিপনশীল জীব—যার জন্মদাতা একটি কম্পিউটার। এটি সম্পূর্ণ কৃত্রিম রাসায়নিক ডিএনএ থেকে তৈরি পৃথিবীর প্রথম জীবন্ত কোষ।”*
> *— জে. ক্রেইগ ভেন্টর (২০ মে ২০১০)*

## JCVI-syn3.0: জীবনের ন্যূনতম জিনোমের সন্ধান (২০১৬)

কৃত্রিম জীব তৈরি সম্ভব প্রমাণের পর ভেন্টরের দল আরও গভীর মৌলিক প্রশ্নের মুখোমুখি হলেন: *স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার জন্য একটি কোষের ঠিক কতটুকু ন্যূনতম জিন বা অপারেটিং সিস্টেম প্রয়োজন?*

প্রথম সিন্থেটিক ব্যাকটেরিয়ার ৯০১টি জিন নিয়ে তাঁরা শুরু করলেন এক নির্মম ছাঁটাই অভিযান:

- তাঁরা প্রতিটি জিনকে চিহ্নিত করলেন: **অপরিহার্য জিন** (যা বাদ দিলে কোষ তাৎক্ষণিকভাবে মারা যায়) এবং **অপ্রয়োজনীয় জিন** (যা বাদ দিলেও কোষ বেঁচে থাকতে পারে)।
- আটটি কৃত্রিম টুকরোয় ভাগ করে তাঁরা শত শত অপ্রয়োজনীয় বিপাকীয় বিলাসিতা ও বিবর্তনের বাড়তি জিন ছেঁটে বাদ দিতে লাগলেন।

২০১৬ সালের মার্চ মাসে বিজ্ঞান বিশ্ব প্রত্যক্ষ করল **JCVI-syn3.0**-এর আত্মপ্রকাশ। এর সম্পূর্ণ জিনোম নেমে এলো মাত্র **৫,৩১,৫৬০ ক্ষারজোড়ে এবং এতে অবশিষ্ট রইল মাত্র ৪৭৩টি জিন**—মহাবিশ্বের জানা সকল স্বাধীন জীবের মধ্যে এটিই হলো ক্ষুদ্রতম ও ন্যূনতম জীবন্ত জিনোম!

## অজানা ৪৭৩ জিনের পরম বিনম্রতা

এই ৪৭৩টি জিনের কাজের তালিকা পরীক্ষা করে জীবনের চরম পদার্থবিজ্ঞান উন্মোচিত হলো:

- **তথ্য প্রক্রিয়াকরণ (৪১%):** সেন্ট্রাল ডগমা পরিচালনা—ডিএনএ রেপ্লিকেশন, ট্রান্সক্রিপশন এবং বিশেষ করে ট্রান্সলেশন বা প্রোটিন তৈরির যন্ত্রপাতি (টিআরএনএ ও রাইবোসোম)। কেবল প্রোটিন তৈরির কাজেই ব্যয় হয় জিনোমের এক-তৃতীয়াংশ!
- **কোষঝিল্লি ও পরিবহন (১৮%):** বাইরে থেকে পুষ্টি গ্রহণ ও কোষীয় অখণ্ডতা রক্ষা।
- **বিপাকীয় শক্তি (১৭%):** পুষ্টি ভেঙে শক্তি ও নিউক্লিওটাইড তৈরি।
- **জিনোম সংরক্ষণ (৭%):** ক্রোমোজোম দ্বিগুণ করা ও কোষ বিভাজন।

কিন্তু বিজ্ঞানের জন্য সবচেয়ে বড় শিক্ষা ছিল অন্য জায়গায়: এই ৪৭৩টি অপরিহার্য জিনের মধ্যে **১৪৯টি জিন (জিনোমের প্রায় ৩২%) আসলে কী কাজ করে—আধুনিক বিজ্ঞান তা আজ পর্যন্ত জানে না!** এই জিনগুলো এতটাই জরুরি যে এদের একটিকে বাদ দিলে কোষ এক সেকেন্ডের ভেতর মারা যায়; অথচ এদের জৈব রাসায়নিক কার্যপদ্ধতি বিজ্ঞানীদের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়। সিন্থেটিক বায়োলজি জীবনের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ইঞ্জিন তৈরি করতে পেরেছে ঠিকই, কিন্তু একই সাথে প্রমাণ করেছে যে জীবনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মূল কলকব্জা এখনো মানব জ্ঞানের অতীত এক পরম রহস্য হয়ে রয়েছে।

*সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "কৃত্রিম ক্রোমোজোম — ক্রেইগ ভেন্টর, JCVI-syn3.0 ও সিন্থেটিক জীবনের সূচনা"। জিনতত্ত্বের ইতিহাস, খণ্ড ১৯। https://shakilmahmud.com/bn/story-of-genetics-part-19-artificial-chromosome-venter-jcvi-syn3-minimal-synthetic-life-bn/*

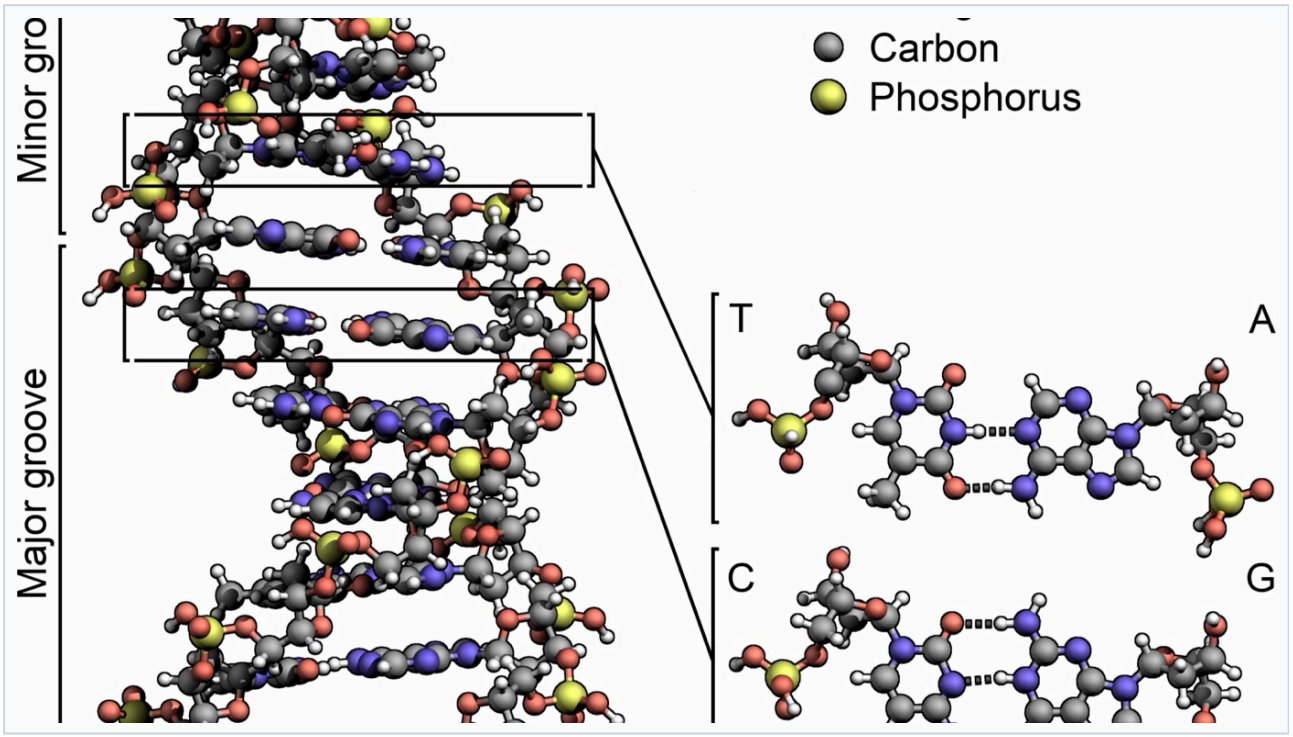
Shakil Mahmud • Research Monograph

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • বিংশ খণ্ড

# মহাবিশ্বের পরবর্তী অধ্যায় — প্রাইম এডিটিং, জিন ড্রাইভ ও জীবনের স্বাধীন স্থাপত্য

*মহাবিশ্বের পরবর্তী অধ্যায় — প্রাইম এডিটিং, জিন ড্রাইভ ও জীবনের স্বাধীন স্থাপত্য*

783 শব্দ • November 2, 2026 • ওয়েব সংস্করণ




**চিত্র ২০:** *ডিএনএ ডাবল হেলিক্সের ত্রিমাত্রিক আণবিক স্থাপত্য: পার্থিব জীবজগতের সার্বজনীন জেনেটিক নীলনকশা।*

মাত্র এক শতাব্দীর ব্যবধানে মানব সভ্যতা গ্রেগর মেন্ডেলের মঠের বাগান থেকে পৌঁছে গেছে **প্রকৃতি-পরবর্তী জিনোমের (Post-Natural Genome)** এক মহাজাগতিক স্বর্ণদ্বারে। মটরশুঁটির দানার সাদা-কালো হিসাব থেকে শুরু করে ডাবল হেলিক্সের রহস্যভেদ, পূর্বপুরুষদের ৩১০ কোটি ক্ষারের পাঠোদ্ধার এবং কম্পিউটারের স্ক্রিন থেকে কৃত্রিম জীব সৃষ্টি—বিজ্ঞানের এই জয়যাত্রা মানব ইতিহাসকে চিরতরে বদলে দিয়েছে। কিন্তু ক্রিসপারের প্রাথমিক হাতিয়ারগুলো ছিল অনেকটা আণবিক ডিনামাইটের মতো: ডিএনএ-র দুই সুতো কেটে ফেলে তা কোষের বিশৃঙ্খল মেরামতের ওপর নির্ভর করত, যার ফলে প্রায়ই অনিচ্ছাকৃত ভুল ক্ষার ঢুকে পড়ত। আণবিক জিনতত্ত্ব যখন তার পরিণত রূপ ধারণ করছে, তখন **বেস এডিটিং**, **প্রাইম এডিটিং** এবং **এপিজিনোম এডিটিং**-এর মতো অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সেই ভোঁতা কাঁচিকে পরিণত করেছে এক নিখুঁত ও সার্বভৌম ওয়ার্ড প্রসেসরে—যা মানবজাতিকে দিয়েছে জীবনের স্থাপত্যের ওপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব।

## বেস এডিটিং ও প্রাইম এডিটিং: ডিএনএ না ভেঙেই কোড সংশোধন

২০১৬ ও ২০১৭ সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নবিদ **ডেভিড আর. লিউ** এক মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করলেন: *একটিমাত্র ভুল রাসায়নিক অক্ষর ঠিক করার জন্য কেন আমাদের আস্ত ডিএনএ-র সুতো দুটিকে ভেঙে ফেলতে হবে?* মানুষের অধিকাংশ জিনগত রোগ ঘটে মাত্র একটি ক্ষারের মিউটেশনের কারণে—যেমন C বদলে T হয়ে যাওয়া, বা A বদলে G হয়ে যাওয়া।

লিউ তৈরি করলেন **বেস এডিটর** (Base Editors): এক বিশেষ সংকর প্রোটিন যা ডিএনএ-র দুই সুতো কাটে না; বরং সে একটিমাত্র ক্ষারকে রাসায়নিকভাবে পরিবর্তন করে দেয়:

- **সাইটোসিন বেস এডিটর (CBE):** যা সাইটোসিনকে ডিমিনেট করে ইউরাসিলে রূপান্তরিত করে, এবং কোষ নিজে থেকেই তাকে থাইমিনে রূপান্তর করে নেয় ($textC - Grightarrowtext T - A$)।
- **এডেনিন বেস এডিটর (ABE):** প্রকৃতিতে এমন কোনো এনজাইম ছিল না যা ডিএনএ-র এডেনিন পরিবর্তন করতে পারে। লিউয়ের দল গবেষণাগারে কৃত্রিমভাবে বিবর্তিত এক এনজাইম (TadA) তৈরি করলেন যা এডেনিনকে ইনোসিনে রূপান্তর করে, যা কোষ পড়ে গুয়ানিন হিসেবে ($textA - Trightarrowtext G - C$)।

২০১৯ সালে লিউ আবিষ্কার করলেন জিনোম এডিটিংয়ের চূড়ান্ত প্রযুক্তি: **প্রাইম এডিটিং** (Prime Editing)। প্রাইম এডিটিংয়ে একটি Cas9 নিকিজের সাথে জুড়ে দেওয়া হয় **রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ** এনজাইম এবং তৈরি করা হয় এক বিশেষ **প্রাইম এডিটিং গাইড আরএনএ (pegRNA)**। এই pegRNA কেবল কাঙ্ক্ষিত ঠিকানায় নিয়ে যায় না; তার লেজের মধ্যে লেখা থাকে *সংশোধিত নতুন বাক্যটি*! Cas9 ডিএনএ-র একটি সুতোয় সামান্য আঁচড় কাটে; রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ আরএনএ দেখে দেখে নতুন সঠিক ক্ষারগুলো সরাসরি ক্রোমোজোমে লিখে দেয়; আর কোষ সেই ফ্ল্যাপটি জুড়ে দেয় বিন্দুমাত্র কোনো ভাঙন সৃষ্টি না করে! প্রাইম এডিটিং দিয়ে ১২ ধরণের ক্ষার পরিবর্তনের সবগুলোই নিখুঁতভাবে করা সম্ভব—বিন্দুমাত্র ক্ষতিকর ত্রুটি ছাড়াই।

## সিন্থেটিক জিন ড্রাইভ ও বাস্তুতন্ত্রের রূপান্তর

জিনতত্ত্ব আজ আর কেবল একক রোগী বা ফসলের ভেতর সীমাবদ্ধ নেই; তা **সিন্থেটিক জিন ড্রাইভ** (Synthetic Gene Drives)-এর মাধ্যমে সমগ্র বন্য প্রকৃতির বাস্তুতন্ত্রকে পুনর্লিখনের ক্ষমতা অর্জন করেছে। মেন্ডেলের সাধারণ নিয়মে পিতা বা মাতার একটি জিন সন্তানের মাঝে স্থানান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ঠিক ৫০%। কিন্তু জিন ড্রাইভ এই নিয়মকে চূর্ণ করে দেয়।

ম্যালেরিয়া বহনকারী মশার (*Anopheles gambiae*) বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টিকারী জিনের পাশে যদি একটি ক্রিসপার মেশিনারি জুড়ে দেওয়া হয়, তবে তা নিজের প্রতিলিপি তৈরি করতে থাকে:

1. জননকোষ সৃষ্টির সময় ক্রিসপার অপর স্বাভাবিক ক্রোমোজোমটিকে কেটে ফেলে এবং কোষ সেই ভাঙা অংশ সারাতে গিয়ে জিন ড্রাইভটিকে হুবহু নকল করে বসিয়ে দেয়।
2. ফলে হেটেরোজাইগাস জীব মুহূর্তের মধ্যে হোমোজাইগাসে পরিণত হয়।
3. ৫০% সম্ভাবনার বদলে পরবর্তী প্রজন্মের **শতভাগ সন্তানের রক্তে সেই জিন প্রবেশ করতে বাধ্য হয়!**

মাত্র কয়েক ডজন প্রজন্মের ব্যবধানে একটি কৃত্রিম জিন ড্রাইভ সমগ্র মহাদেশের মশার বংশধরদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে ম্যালেরিয়া বা ডেঙ্গুর মতো মারণব্যাধিকে পৃথিবী থেকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে। প্রকৃতির বিবর্তনকে এভাবে পরিচালনা করার ক্ষমতা মানবজাতিকে এমন এক নৈতিক ও বাস্তুতাত্ত্বিক দায়িত্বের মুখোমুখি করেছে যা পৃথিবীর ইতিহাসে অতীতে কখনো দেখা যায়নি।

Shakil Mahmud • Research Monograph

## আট অক্ষরের ডিএনএ: হাচিমোজি ও জেনোবায়োলজি

চারশো কোটি বছর ধরে পৃথিবীর জীবজগৎ মাত্র চারটি ক্ষার ($textA, T, G, C$) এবং বিশটি অ্যামিনো অ্যাসিডের সীমাবদ্ধতায় জীবন ধারণ করেছে। কিন্তু আজকের সিন্থেটিক জীববিজ্ঞানীরা প্রকৃতির সেই বর্ণমালাকে আরও সম্প্রসারিত করে তুলেছেন। ২০১৯ সালে বিজ্ঞানী স্টিভেন বেনার তৈরি করলেন **হাচিমোজি ডিএনএ** (জাপানি শব্দ *হাচি* অর্থাৎ আট এবং *মোজি* অর্থাৎ অক্ষর)—একটি আট অক্ষরের ডাবল হেলিক্স, যার মধ্যে চারটি প্রাকৃতিক ক্ষারের পাশাপাশি রয়েছে চারটি সম্পূর্ণ কৃত্রিম নতুন ক্ষার ($P, Z, B, S$)। এই আট অক্ষরের ডিএনএ রেপ্লিকেট করে, আরএনএ তৈরি করে এবং স্বাভাবিক ডিএনএ-র দ্বিগুণ তথ্য ধারণ করতে সক্ষম!

একই সাথে বিজ্ঞানীরা চার অক্ষরের কোডন পাঠ করতে সক্ষম রাইবোসোম তৈরি করেছেন—যা দিয়ে এমন সব কৃত্রিম অ্যামিনো অ্যাসিড প্রোটিনে জুড়ে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে যা পার্থিব প্রকৃতির কোথাও কোনোদিন জন্ম নেয়নি।

## মহাজাগতিক পরিণতি

আজ আমরা দাঁড়িয়ে আছি অন্ধ প্রাকৃতিক বিবর্তনের গোধূলিলগ্নে এবং সচেতন জিনোম স্থাপত্যের স্বর্ণালী ঊষালগ্নে। জিনোম আজ আর নিছক জীবদেহের উত্তরাধিকার নয়; এটি হলো তথ্য সংরক্ষণের এক মহাজাগতিক মাধ্যম। বিজ্ঞানীরা আজ মানবজাতির যাবতীয় জ্ঞান—এনসাইক্লোপিডিয়া, শেক্সপিয়ারের নাটক, অমর সঙ্গীত—কৃত্রিম ডিএনএ-র ফিতায় লিখে সংরক্ষণ করছেন, যা লক্ষ লক্ষ বছর ধরে অপরিবর্তিত থেকে টিকে থাকবে যেকোনো ডিজিটাল হার্ডডিস্কের চেয়েও বেশি সময়।

১৮৫৬ সালে ব্রনোর মঠের বাগানে গ্রেগর মেন্ডেলের মটরশুঁটির সেই নিঃসঙ্গ পদচারণা থেকে শুরু করে ওয়াটসন, ক্রিক ও ফ্র্যাঙ্কলিনের ডাবল হেলিক্স, হিউম্যান জিনোম প্রজেক্টের অ্যালগরিদম এবং ক্রিসপারের প্রোগ্রামযোগ্য স্ক্যালপেল—জিনতত্ত্বের ইতিহাস হলো মানব চেতনার আত্মপরিচয় সন্ধানের এক প্রামাণ্য মহাকাব্য। ডিএনএ-র ভাষা উন্মোচনের মধ্য দিয়ে এই মহাবিশ্ব এক অভাবনীয় সত্যের মুখোমুখি হয়েছে: মানব চেতনার মাধ্যমে এই মহাবিশ্ব আজ নিজের সৃষ্টির মূল সংবিধানকে স্বহস্তে পুনর্লিখন করতে শুরু করেছে।

*সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "মহাবিশ্বের পরবর্তী অধ্যায় — প্রাইম এডিটিং, জিন ড্রাইভ ও জীবনের স্বাধীন স্থাপত্য"। জিনতত্ত্বের ইতিহাস, খণ্ড ২০।*
*https://shakilmahmud.com/bn/story-of-genetics-part-20-post-natural-genome-prime-editing-gene-drives-future-bn/*

আকর গ্রন্থ ও গবেষণা সূত্র

# নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

❖

*এই মনোগ্রাফে আলোচিত তত্ত্ব, গাণিতিক প্রতিপাদন এবং ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের ভিত্তি হিসেবে নিম্নলিখিত আকর গ্রন্থ ও প্রাথমিক গবেষণাপত্রসমূহ ব্যবহৃত হয়েছে:*

**Mendel, Gregor** (1866). *Versuche über Pflanzen-Hybriden*. Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn, 4: 3–47.

**Morgan, Thomas Hunt, Sturtevant, A. H., Muller, H. J., & Bridges, C. B.** (1915). *The Mechanism of Mendelian Heredity*. Henry Holt and Company, New York.

**Avery, Oswald T., MacLeod, C. M., & McCarty, M.** (1944). *Studies on the Chemical Nature of the Substance Inducing Transformation of Pneumococcal Types*. Journal of Experimental Medicine, 79(2): 137–158.

**Hershey, Alfred D., & Chase, Martha** (1952). *Independent Functions of Viral Protein and Nucleic Acid in Growth of Bacteriophage*. Journal of General Physiology, 36(1): 39–56.

**Watson, James D., & Crick, Francis H. C.** (1953). *Molecular Structure of Nucleic Acids: A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid*. Nature, 171(4356): 737–738.

**Crick, Francis** (1970). *Central Dogma of Molecular Biology*. Nature, 227(5258): 561–563.

**Jacob, François, & Monod, Jacques** (1961). *Genetic Regulatory Mechanisms in the Synthesis of Proteins*. Journal of Molecular Biology, 3(3): 318–356.

**McClintock, Barbara** (1950). *The Origin and Behavior of Mutable Loci in Maize*. PNAS, 36(6): 344–355.

**Sanger, Frederick, Nicklen, S., & Coulson, A. R.** (1977). *DNA Sequencing with Chain-Terminating Inhibitors*. PNAS, 74(12): 5463–5467.

**Mullis, Kary, et al.** (1986). *Specific Enzymatic Amplification of DNA In Vitro: The Polymerase Chain Reaction*. Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology, 51: 263–273.

**International Human Genome Sequencing Consortium** (2001). *Initial Sequencing and Analysis of the Human Genome*. Nature, 409(6822): 860–921.

**Jinek, Martin, Chylinski, K., Fonfara, I., Hauer, M., Doudna, J. A., & Charpentier, E.** (2012). *A Programmable Dual-RNA-Guided DNA Endonuclease in Adaptive Bacterial Immunity*. Science, 337(6096): 816–821.

**Hutchison, Clyde A. III, et al.** (2016). *Design and Synthesis of a Minimal Bacterial Genome*. Science, 351(6280): aad6253.

Shakil Mahmud • Research Monograph

লেখক পরিচিতি

# লেখক পরিচিতি

❖

## Shakil Mahmud

*গবেষক, লেখক ও সফটওয়্যার প্রকৌশলী*

শাকিল মাহমুদ একজন স্বাধীন গবেষক, লেখক ও সফটওয়্যার প্রকৌশলী। তাঁর প্রধান আগ্রহের বিষয় হলো তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞান, গণিতের ইতিহাস, আধুনিক ম্যাক্রোঅর্থনীতি, কম্পিউটিংয়ের বিবর্তন এবং স্থান-কালের দার্শনিক তাৎপর্য। তিনি জটিল দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ধারণাকে গভীর ও সুললিত ভাষায় উপস্থাপন করতে পছন্দ করেন। তাঁর সার্বিক কাজ পাওয়া যাবে তাঁর ব্যক্তিগত গবেষণা পোর্টাল **shakilmahmud.com** এ।

**COLOPHON**

Typeset in EB Garamond (English) and Kohinoor Bangla / Noto Serif Bengali (Bengali).
Mathematical typesetting generated with Donald Knuth's TeX algorithms and KaTeX.
Published digitally as a monolithic research monograph by Shakil Mahmud Editorial Series.
Dhaka & Singapore • 2026 • https://shakilmahmud.com